মিলনমাধুরী



নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক—
শ্রীসুভাষ চন্দ্র সুর

শরৎ-সাহিত্য-ভবন
২৫, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ,
কলিকাতা-৪

প্রথম প্রকাশ— ফাল্গুন, ১৩৭১

মুদ্রাকর—শ্রীনির্ম্মল বসু
৫।১ বিডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬



—"কি হবে ছোটবৌ ?"

—"কি আবার হবে। ভগবানের মনে যা আছে তাই হবে। এখন উঠে মুখে-হাতে জল দাও।"

প্রিয়নাথ উঠিলেন না, মুখে-হাতে জল দিবারও কোনো উদ্যোগ করিলেন না; উদাস ভাবে শুধু 'যাই' বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন।

স্বামীর এই উদাসীনতা দেখিয়া ছোটবৌ আন্নাকালী শঙ্কিত হইয়া বলিল, "যাই ব'লে ব'সে রইলে যে গো! কি এত ভাবছো ?"

চাপিয়া-চাপিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে-ফেলিতে প্রিয়নাথ বলিলেন, "ভাবছি কত কি···ভাবছি আকাশ-পাতাল···কি হবে····কি করবো····"

স্বামীর নৈরাশ্যমলিন মুখের দিকে চাহিয়া আন্নাকালীর দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিলেও চোখের জল চোখে চাপিয়া, স্বরে একটা অস্বাভাবিক জোর আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "যা হবে, তুমিও তার রোধ করতে পারবে না, আমিও না। তবে আর শুধু-শুধু ভেবে দেহটাকে মাটি ক'রে লাভ কি ?"

কোনরকমে উদ্গত নিঃশ্বাস রোধ করিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "লাভ যে কিছু নেই তা জানি ছোটবৌ, তবুও ভাবছি। মনে হচ্ছে, যখন ভাবলে লোকসান হতো না তখন যদি ভাবতুম ! শেষ আশা ছিল এই শেষ-মামলাটার ওপর। উকিল-মোক্তাররা আশা দিয়েছিল এ-মামলায় নিশ্চয়ই জিত হবে। কিন্তু 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়'—সে জিতের পাশাও এমন ভাবে উল্টে গেল যে, তার ধাক্কা সামলাতে এখন না গাছতলায় দাঁড়াতে হয় !"

স্বামীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আন্নাকালী বলিল, "হয় হবে। গাছতলায় তো আর তুমি একা দাঁড়াবে না ; দাঁড়াতে হয়, সকলে মিলে দাঁড়াবো। তার জন্যে আবার এত ভাবনা কেন ?"

স্ত্রীর মুখের উপর নৈরাশ্যমলিন দৃষ্টি রাখিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "একা দাঁড়াতে হ'লে তো কোনো ভাবনাই ছিল না

ছোটবৌ ; কিন্তু এইসব অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে নিয়ে—তোমাকে নিয়ে—উঃ ! নলে ছেলেটার মনে এতও ছিল ? এতদিন তাকে বুকে ক'রে মানুষ ক'রে—"

উদ্গত বাষ্পরাশিতে কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রিয়নাথের চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া আন্নাকালীর চোখও সজল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া সে স্নিগ্ধকোমলস্বরে বলিল, "ছি, ও-কথা মুখে এনো না। একদিন যাকে বুকে ক'রে মানুষ ক'রেছো, আজ তার এইটুকু অত্যাচার সহ্য ক'রতে পারবে না ?"

চোখ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "সহ্যের একটা সীমা আছে জানো ?"

আন্নাকালী বলিল, "তা থাকতে পারে, কিন্তু স্নেহের সীমা নেই সে-কথাও তো ঠিক। আজ যদি তোমার ছেলে রাধু এর চেয়েও বেশী অত্যাচার করতো তাহ'লে কি করতে তুমি ?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "অত্যাচার তবুও সহ্য করা যায়, কিন্তু বেইমানী অসহ্য।"

"—না। সংসারে থাকতে হ'লে সবই সহ্য করতে হয়।"

—"হয়তো হয়, কিন্তু আমি পারছি না। কারণ আমি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি—নিজের বোকামির জন্যে তোমাদের আজ পথে বসিয়েছি। না না, আমার এ দুঃখে সান্ত্বনা নেই।"

আন্নাকালী বলিল, "নল রাজা পাশাখেলায় হেরে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বনবাসী হয়েছিলেন, আর তুমি না হয় ন্যায় কাজ করতে গিয়ে একটু কষ্টে পড়েছো। তার তুলনায় এটা আর এমন কি বেশী তুক্‌খু ?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "এর চেয়েও বেশী তুঃখ আছে নাকি ?"

—"খুব আছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা, রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা আর ভগবান রামচন্দ্রের কথাগুলো একবার ভাবো।"

স্ত্রীর সান্ত্বনাপ্রফুল্ল মুখের দিকে প্রিয়নাথ বিস্ময়পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিলেন।

আন্নাকালী বলিল, "যাক্, এখন আহ্নিক সেরে খেতে বোসো। মামলায় হার হ'লে লোক উপোস দিয়ে দিন কাটায় না।" বলিয়া সে স্বামীর হাত ধরিয়া টানিল।

সে স্নেহাকর্ষণ প্রিয়নাথ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না ; উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া মুখে-হাতে জল দিলেন, তারপর আহ্নিক শেষ করিয়া আহারে বসিলেন।

খাইতে বসিয়া প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "চাল আজ কোথায় পেলে—ধার করেছো বুঝি ?"

আন্নাকালী বলিল, "ধার করবো কেন, আর কার কাছেই-বা ধার করতে যাবো ? কিনে আনিয়েছি।"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "কিন্তু ঘরে তো টাকা ছিল না !"

—"টাকা না থাকলে আর এলো কোথা হতে ?"

—"সেই কথাই তো জিজ্ঞাসা করছি।"

আন্নাকালী বলিল, "ছিল গো, ছিল। ও আমার অনেক দিনের একটা লুকনো টাকা ছিল।"

প্রিয়নাথ মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

আন্নাকালী বলিল, "হাসলে যে বড় ?"

প্রিয়নাথ উত্তর দিলেন, "একটা পয়সার জন্যে যখন দিন চলে না তখনও বাক্সের ভেতর লুকনো টাকা থাকে শুনলে যে হাসি আপনা হতেই আসে!" বলিয়া তিনি স্ত্রীর মুখের উপর সহাস্যদৃষ্টি স্থাপন করিতেই আন্নাকালী মৃদু হাসিয়া মুখটা ফিরাইয়া লইল।

প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু এমন লুকনো টাকায় আর ক-দিন চলবে ?"

আন্নাকালী বলিল, "যে ক-দিন চলে। ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো, যেদিন যায় সেদিন—"

বাধা দিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "কিন্তু সে চাঁদের আলোটুকুও তো প্রায় শেষ হয়ে এলো। এবার আসছে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার!"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া আন্নাকালী বলিল, "আসে আসুক। তুমি অত হতাশ হয়ো না।"

বিষাদের মলিনহাসি হাসিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "আশা না থাকলেই হতাশ হতে হয়—মানে, তোমার এক টাকার চালে তিন দিনের বেশী আর এক বেলাও চলবে না।"

কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া আন্নাকালী বলিল, "তিন দিন হোক্

আর পাঁচ দিন হোক্, তোমার সে খোঁজে দরকার কি বলো তো? সারা দিনের পর খেতে বসেছো—খেয়ে নাও। বাজে ব'কে লাভ কি?"

—"বেশ, আর বকবো না" বলিয়া প্রিয়নাথ নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিলেন।

স্বামীকে বকিতে বারণ করিয়াও আন্নাকালী নিজে না বকিয়া থাকিতে পারিল না; কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসার সুরে ধীরে-ধীরে বলিল, "আচ্ছা, তুমি কি একটা চাকরি যোগাড় করতে পারো না?"

স্ত্রীর কথা শুনিয়া প্রিয়নাথ এমন জোরে হাসিয়া উঠিলেন যে, সেই হাস্যোচ্ছ্বাসে তাঁর মুখের ভিতরকার ভাতগুলা চারিদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

দারুণ লজ্জায় আন্নাকালী মাথা নাচু করিল।

কষ্টে হাস্যবেগ সংবরণ করিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "বৈকুণ্ঠ মল্লিকের ছেলে শেষে—চাকরি করতে যাবে ছোটবৌ?"

উত্তর দিতে গিয়া ছোটবৌ এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। ভাবিল···সে-কথা ঠিক। যাদের ঘরে চাকরি করিয়া কত লোক বড়মানুষ হইয়া গেছে, দুরবস্থায় পড়িয়াছে বলিয়া সে আজ চাকরির জন্য অন্যের দ্বারস্থ হইবে? চিরকাল প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে যারা, তারা কি অপরের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে পারে?···অসাবধানে কথাটা বলিয়া ফেলিয়া আন্নাকালী খুব লজ্জিত হইল।।

স্ত্রীর এই লজ্জার কারণ বুঝিতে পারিয়া, হাসি থামাইয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "অবস্থার ফেরে পড়লে সবই করতে হয় জানি, কিন্তু কি চাকরি করবো? একে তো চাকরি করা অভ্যাস নেই, তার ওপর ছেলেবেলা থেকে আদরের দুলাল হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, লেখাপড়া কিছু হয়নি। দাদা ইস্কুল যাবার জন্যে শাসন করতে এলে, পিসীমা বলতেন— 'লেখাপড়া শিখে ওর হবে কি? ওকে তো আর চাকরি ক'রে খেতে হবে না।'······আজ যদি পিসীমা বেঁচে থাকতেন তাহ'লে বুঝতে পারতেন, কি ভুল ধারণা নিয়েই তিনি এতটা আদর দিয়েছিলেন!"

আন্নাকালী নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। প্রিয়নাথ স্ত্রীর এই লজ্জার গুরুত্বকে লঘু করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "তা, ইংরিজী তেমন না জানলেও, বাংলা লেখাপড়া তো একটু-আধটু জানা আছে, দেখি যদি কোনো দোকানে-টোকানে—"

ব্যস্ততার সহিত আন্নাকালী বলিয়া উঠিল, "না না দোকানের চাকরি আর তোমাকে দেখতে হবে না। ওসব কাজ তুমি করতে পারবে না।"

প্রিয়নাথ এবার হাসিয়া ফেলিলেন; বলিলেন,"মানুষ পারে না কি ছোটবৌ? মানুষ যদি স্বার্থের জন্যে স্নেহ-দয়া-মায়া সব বিসর্জ্জন দিতে পারে, জাল-জুয়াচুরি ক'রে হয়কে নয়—নয়কে হয় করতে পারে, তবে পেটের ভাতের জন্যে আমিই-বা কেন চাকরি করতে পারবো না! অভিমান? আজ-বাদে কাল

দেনার দায়ে যার ঘর-বাড়ী বিক্রি হবে, থালা-ঘটি-বাটি পর্য্যন্ত নিলামে উঠবে তার আবার অভিমান কিসের ?”

নিজের দৈন্য স্মরণে অভিমানটাকে দূরে রাখিতে চাহিলেও, সেই অভিমানেই প্রিয়নাথের স্বরটা রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাড়াতাড়ি কয়েক গ্রাস ভাত মুখে তুলিবার পর জল খাইয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

আঁচলে চোখ মুছিয়া আন্নাকালী স্বামীকে আচমনের জল আগাইয়া দিল।

রমানাথ মল্লিকের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে মল্লিকবংশের লক্ষ্মী যখন চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন তখন চঞ্চলাকে বাঁধিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মীর কৌটা লইয়া খুড়া-ভাইপোর মধ্যে এমন বিবাদ বাধিয়া উঠিল যে, তাতে মানুষ দূরের কথা, মালক্ষ্মী পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন এবং যে লক্ষ্মীকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য বিবাদের সূচনা,—বিবাদের অবসানের পূর্ব্বেই তিনি মল্লিকবংশের তিন পুরুষের মায়া-মমতা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, উকীল-মোক্তারদের ব্যাঙ্কের খাতার পৃষ্ঠাগুলা শীঘ্র-শীঘ্র পূরণ করিয়া দিতে লাগিলেন। সিঁদুর-চন্দন-মাখানো কৌটা শূন্যগর্ভ হইয়া মল্লিকদের ঠাকুরঘরের

কুলঙ্গীতে যেমন চিরকাল থাকিত তেমনি রহিল, আর সেই গজভুক্ত কপিত্থের লোভে খুড়া-ভাইপো দুইজন জমিদারী-বাগান-বাগিচা—এমনকি, বাস্তুভিটার মায়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া, গজকচ্ছপের মত বিরামবিহীন যুদ্ধে মত্ত হইয়া রহিল। ওদিকে দৈন্য রূপ গরুড় যে তাঁদের উভয়কে গ্রাস করিবার জন্য বিকট বদন মেলিয়া একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে ইহা কেহই লক্ষ্য করিতে পারিল না।

বিষয় যে খুব বেশী তা নয়, বাৎসরিক হাজার-কুড়ি টাকা আয়ের সম্পত্তি মাত্র। এই আয়ে বড়মানুষি চালে চলিয়া, দান-ধ্যান-দোল-দুর্গোৎসব ইত্যাদি বারো মাসে তের পর্ব্ব নির্ব্বাহ করিতে হইত, কাজেই জমিত না কিছুই, মাছের তেলে মাছ-ভাজা হইত মাত্র। লোকে কিন্তু মল্লিকবাবুদের টাকায় শেওলা ধরিয়া টাকাগুলা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িতেছে কি না এই আশঙ্কায় যথেষ্ট উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিত!

তারপর রমানাথ মল্লিক মারা গেলে, উপযুক্ত সমারোহ করিয়া তাঁর শ্রাদ্ধ-কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া ঘোষপুরের গগন মিত্রের কাছে যখন দুই হাজার টাকা ঋণ লইতে হইল, তখন লোকপরম্পরায় খবর পাইয়া সকলে বড়মানুষের বড়মানুষির অন্তরালে কি ভয়ানক অভাব নিহিত রহিয়াছে, বিস্ময়সহকারে তার আলোচনা করিতে লাগিল। এইসব লোকের মধ্যে বুদ্ধিমান্ বলিয়া যাদের খ্যাতি ছিল তারা নিজেদের অসাধারণ বুদ্ধিবলে এই অভাবের মধ্যে যে

একটা গভীর রহস্যের উদ্‌ঘাটন করিল, তাতে আর-সকলের বিস্ময় না কমিয়া বরং আরও বাড়িয়া গেল এবং প্রিয়নাথের সরলতার উপর তাদের যে একটা গভীর শ্রদ্ধা ছিল তা যেন অনেকটা কমিয়া আসিল। ছি—ছি, নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি ছোটবাবুর এই ব্যবহার!

ছোটবাবুর এই প্রতারণামূলক দুরভিসন্ধি সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, নাবালকের একমাত্র অভিভাবক মাতুল শ্রীবৈদ্যনাথ সরকার মহাশয়। অবশ্য রমানাথ মল্লিক মহাশয় বৈদ্যনাথকে একটা ছোট মহালের নায়েবী পদ ছাড়া তাঁর নাবালক পুত্রের অভিভাবকের পদে নিযুক্ত করিয়া যান নাই; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর শোণিত-সম্বন্ধের সুদৃঢ় আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বৈদ্যনাথবাবু স্বয়ং উপযাচক ভাবে ভাগিনেয়ের অভিভাবকের পদ অধিকার করিয়া বসিলেন এবং নায়েবীর মায়া ত্যাগ করিয়া বিধবা ভগিনী ও নাবালক ভাগিনেয়ের স্বার্থরক্ষায় একান্ত যত্নবান্ হইয়া পড়িলেন। প্রিয়নাথ ইহাতে একটুও বাধা দিলেন না, বরং ভ্রাতৃবিয়োগশোকে বিহ্বল হইয়া যখন তিনি কি করা কর্ত্তব্য ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না তখন সহসা এইরূপ একজন আত্মীয়কে পরামর্শদাতা রূপে পাইয়া যথেষ্ট উৎফুল্ল ও নিশ্চিন্ত হইলেন। সুতরাং বৈদ্যনাথ অচিরেই সংসারে নিজের আধিপত্য অবাধে বিস্তার করিয়া ফেলিলেন।

তাঁর এই কর্ত্তৃত্বের প্রভাব সেইদিন স্পষ্টভাবেই আত্মপ্রকাশ

করিল যেদিন রাধানাথের শ্রাদ্ধে কিজন্য দুই হাজার টাকা ঋণ করিতে হইল ইহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। প্রিয়নাথ ইহার সহজ উত্তর দিলেন—'অর্থাভাব। ঋণ না করিলে উপযুক্ত সমারোহে রমানাথ মল্লিকের শ্রাদ্ধ হইত না।' বৈদ্যনাথ বলিলেন, 'শ্রাদ্ধের জন্য প্রজাদের উপর 'মাথট' বসাইলেই তো ইহার দুই গুণ টাকা আদায় হইত।' প্রিয়নাথ জানাইলেন, প্রজার ঘাড় ভাঙিয়া বড়মানুষি করা মল্লিক-বংশের রীতিবিরুদ্ধ। মল্লিক-গোষ্ঠী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ভিক্ষা করিয়া খাইবে, তবু প্রজাদের রক্ত শোষণ করিয়া সেই অর্থে উদরপূরণ করিবে না।

তাঁর এই উদার উক্তিতে বৈদ্যনাথ মুখে সন্তোষ প্রকাশ করিলেও, অন্তরে প্রীতিলাভ করিতে পারিলেন না। বরং প্রিয়নাথের বংশমর্য্যাদার অভিমানটা যেন গর্ব্বের আকারে তাঁর অন্তরে অপমানের তীব্র কশাঘাত করিল। সে আঘাতে উত্তেজিত হইয়া বৈদ্যনাথ মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'বংশগৌরবে গর্ব্বিত এই প্রিয়নাথ মল্লিককে যদি সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ভিখারীর অধম করিতে না পারি তবে আমি ব্রজ সরকারের ছেলেই নই।'

তারপর স্বামিবিয়োগবিধুরা ভগ্নী শ্যামাসুন্দরীকে বৈদ্যনাথ বুঝাইতে লাগিলেন যে, সংসারে সুখসম্পদ্ চিরস্থায়ী নয়, সুখের পর দুঃখ আছেই এবং সে-দুঃখে অধীর হইয়া সংসারের হাল ছাড়িয়া দিলে চলে না। একজনের অভাবে সংসার যখন

অচল হইয়া থাকে না তখন শোক-দুঃখ সব চাপিয়া রাখিয়া কাজে মন দেওয়াই কর্ত্তব্য। না দিলে—মল্লিক মহাশয় তো স্বর্গে গিয়াছেনই, তাঁর পিছনে-পিছনে বিষয়টাও জাহান্নমে চলিয়া যাইবে! তখন তাঁর বংশের প্রদীপ নলিন দাঁড়াইবে কোথায়? কাজেই, অন্ততঃ নলিনের মুখের দিকে চাহিয়াও ধৈর্য্যধারণ করা দরকার।

ভ্রাতার উপদেশে শ্যামাসুন্দরী ধৈর্য্যধারণ করিলেন বটে, কিন্তু বৈষয়িক কাজে তাঁর মনোযোগ দেওয়ার আবশ্যকতা কি ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। বিষয় আছে, সে বিষয়-সম্পত্তি দেখিবার জন্য প্রিয়নাথ রহিয়াছে; সে থাকিতে মেয়েমানুষের এসব জটিল ব্যাপারে মনোযোগ দিবার কি দরকার?

বৈদ্যনাথ তাঁকে বুঝাইলেন যে, দরকার খুবই আছে যদি নলিনের ভবিষ্যৎ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। কারণ, প্রিয়নাথকে তাঁরা যতই সরলপ্রাণ বলিয়া ধারণা করিয়া থাকুন, আসলে তিনি তা নন্। বৈদ্যনাথের বিশ্বাস, যে যতই সরলচিত্ত হোক, অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে তার সেই সরল চিত্ত আপনা হইতেই কুটিল হইয়া আসে। সংসারে নিজের কোলের দিকে ঝোল না টানিয়া অপরের কোলের দিকে ঠেলিয়া দিতে পারে এমন লোক আছে কি না সন্দেহ!

শ্যামাসুন্দরীও যে তা না জানিতেন তা নয়; জানিলেও কিন্তু প্রিয়নাথের সম্বন্ধে এত-বড় কুৎসিত ধারণাটাকে সহসা মনে স্থান দিতে পারিলেন না। কারণ, মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণেও

রমানাথ রোরুদ্যমানা পত্নীকে আশ্বাস দিয়া বলিয়া গিয়াছেন··· 'কিছু ভেবো না বড়বৌ, আমি চললাম, কিন্তু প্রিয় রইলো। সে থাক্‌তে তোমার বা নলিনের কোনো ভাবনা নেই।'··· সুতরাং প্রিয়নাথের সরলতার উপর অবিশ্বাস করিয়া শ্যামাসুন্দরী স্বামীর শেষ সান্ত্বনাবাণীর অপমান করিতে পারিলেন না।

—"বৌঠান্‌!"

—"কেন ঠাকুরপো ?"

—"তুমি নাকি আমার কাছে হিসাব চেয়েছো ?"

শ্যামাসুন্দরী আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে দেবরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কারণ, প্রিয়নাথের নিকট হিসাব চাহিবার প্রবৃত্তি কোনদিন তাঁর মনে হয় নাই। কিন্তু সে-কথাটা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিলেন না। কারণ, নিজে না চাহিলেও, বৈদ্যনাথই যে তাঁর নাম করিয়া হিসাব দেখিতে চাহিয়াছেন ইহা বুঝিতে তাঁর বিলম্ব হইল না। সুতরাং নিজে এ-সম্বন্ধে নির্দ্দোষ হইলেও তা স্বীকার করিয়া বৈদ্যনাথকে অপ্রতিভ করিতে পারিলেন না; প্রিয়নাথের প্রশ্নের উত্তরে কি বলিবেন নীরবে ভাবিতে লাগিলেন।

প্রিয়নাথ কিন্তু তাঁকে ভাবিবার অবসর না দিয়াই একটু রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কাছে কি তাহ'লে এখন থেকে আমাকে সব কাজের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে ?"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "দিলে কি তোমার অপমান হবে ?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "পুরুষমানুষকে মেয়েমানুষের কাছে হিসাব দিতে হ'লে অপমান একটু হয় বৈ কি।"

—"অপমান হয়, দিও না!"

—"না দেওয়াই উচিত, কিন্তু তুমি যখন চেয়েছো তখন আমি কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব বুঝিয়ে দেবো।"

—"তাই যদি দেবে তবে সে কথা আবার বল্‌তে এসেছো কেন ?"

—"বল্‌তে আসি নি, জান্‌তে এসেছি, এত-বড় অন্যায়টা তুমি করেছো কি না !"

লজ্জা আসিয়া মাথাটাকে নীচু করিয়া দিতে উদ্যত হইলেও শ্যামাসুন্দরী সে-লজ্জা ঠেলিয়া রাখিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এটা কি এতই অন্যায় হ'লো ঠাকুরপো ?"

ক্রুদ্ধ ভাবে মাথা নাড়িতে-নাড়িতে প্রিয়নাথ উত্তর করিলেন, "খুব অন্যায় হতো না বৌঠান, যদি অপরের মুখ দিয়ে এই অবিশ্বাসের কথাটা প্রকাশ না করতে।"

রুক্ষস্বরে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "অপর কে ? দাদা তো ?"

প্রিয়নাথ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তিনি তোমার দাদা, কিন্তু আমার কেউ নন্।"

অন্যায়ের গুরুত্বটা বুঝিতে পারিয়া শ্যামাসুন্দরী চুপ করিয়া রহিলেন।

প্রিয়নাথ বলিলেন, "আমার দাদা কখনো আমার কাছে হিসাব চাইতে পারেন নি, আর তিনি তিন মাস গত না হতেই তোমার দাদার কাছে হিসাব দিয়ে যে নিজেকে খাঁটি রাখতে হবে, সে আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না বৌঠান্।"

ক্রোধগম্ভীরস্বরে শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন "লোকের কাছে নিজেকে খাঁটি রাখতে পারবে না, কিন্তু অবিশ্বাসী হয়ে থাক্‌তে পারবে তো?"

উগ্রকণ্ঠে প্রিয়নাথ বলিলেন, "আমাকে অবিশ্বাস করে কে? ভগ্নীপতির অন্নদাস—বদ্যিনাথবাবু?"

ভ্রাতার প্রতি এই অশিষ্ট উক্তিতে শ্যামাসুন্দরীর কৃত্রিম ক্রোধ বাস্তব ক্রোধে পরিণত হইল। রোষকম্পিতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "দাদা তোমাদের অন্নদাস নয় ঠাকুরপো। সে চাকরি ক'রে খায়।"

উত্তেজিতকণ্ঠে প্রিয়নাথ বলিলেন, "তাহ'লে চাকরের উচিত নয় তার মনিবের কাছে কৈফিয়ত চাওয়া।"

বলিয়া প্রিয়নাথ ক্রোধকম্পিতপদে সেস্থান ত্যাগ করিলেন।

রোষে, অভিমানে শ্যামাসুন্দরী আপন মনে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

তারপর ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হইতেই শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ঠাকুরপোর কাছে হিসাব চেয়েছো দাদা?"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "হিসাব চাইতে যাবো কেন? তবে বলেছিলাম, যেদিন হতে মল্লিকমশায় ব্যায়রামে পড়েছিলেন, সেইদিন থেকে খাতাপত্রগুলো মিলিয়ে হিসাব-নিকাশটা ঠিক ক'রে রাখলে ভালো হয়।"

গম্ভীর ভাবে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "একে হিসাব চাওয়া ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?"

ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে বৈদ্যনাথ বলিলেন, "কিন্তু এরকম একটা হিসাব ঠিক না রাখলে, কাজকর্ম্ম চলবে কেন?"

তর্জ্জন করিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, কাজকর্ম্ম চলুক না চলুক তাতে তোমার কি?"

অভিমানে মুখখানাকে ভারি করিয়া বৈদ্যনাথ উত্তর দিলেন, "না, আমার নিজের আর কি? তবে আমার ভগ্নী বা ভাগ্নেকে পাছে পথে বসতে হয় এই ভয়।"

—"তাদের পথে বসবার মতন কিছু দেখেছো কি?"

—"না দেখলে এমন কথা বলবো কেন?"

—-শুধু বললেই হবে না, যদি তাই হয়, তুমি সে পথে-বসা রোধ করতে পারবে?"

ঈষৎ হাসিয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন, "এতকাল জমিদারী-সেরেস্তায় কাজ ক'রে কি সে ক্ষমতাটুকুও হয় নি শ্যামা?"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "কেবল ঐটুকু ক্ষমতা হ'লেই চলবে না; জমিদারী চালাবার ক্ষমতা আছে?"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "এ তো বিশ হাজার টাকা আয়ের

একটা সামান্য জমিদারী। ভার পেলে বোধহয় এর চাইতে ঢের বড় জমিদারী চালাতে পারি।"

একটু ভাবিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "বেশ, তাহ'লে ফের তুমি ঠাকুরপোর কাছে হিসাব চাইবে।"

চিন্তিত ভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন, "কিন্তু তিনি কি সহজে হিসাব দেবেন ?"

—"সহজে না দেন, জোর ক'রে চাইবে।"

—"তাতেও যদি দিতে না চান ?"

বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তখন কি করা উচিত সে পরামর্শটাও আমাকে দিতে হবে নাকি ?"

বৈদ্যনাথ হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "আর কোনো পরামর্শই দিতে হবে না শ্যামা, এরপর যা পরামর্শের দরকার হবে সেটুকু আমার নিজের বুদ্ধির কাছেই পেতে পারবো।"

বৈদ্যনাথ ঠিক এইরকমই আশাই করিয়াছিলেন। কিন্তু সে আশা যে এত সহজে ফলবতী হইবে তা একবারও ভাবেন নাই। এখন সেই অভাবিত সফলতা লাভে উৎফুল্ল হইয়া তিনি তারপর হইতে হিসাব দিবার জন্য প্রিয়নাথকে জোর তাগাদা করিতে লাগিলেন। সে-তাগাদায় প্রিয়নাথ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন এবং আমলাদের দ্বারা খাতাপত্র প্রস্তুত করাইয়া একদিন হিসাব দাখিল করিলেন। কিন্তু তার আগেই আমলারা যে নানা কারণে বৈদ্যনাথের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল তা তিনি জানিতে পারিলেন না, সুতরাং হিসাবে যখন দশ-বারো হাজার

টাকার গরমিল হইল তখন প্রিয়নাথ শুধু লজ্জিত হইলেন না, অনেকটা শঙ্কিত হইয়াও উঠিলেন। কিন্তু বৈদ্যনাথ সে-সময়ে যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করিয়া তাঁকে অভয় দিয়া বলিলেন, "এরকম হয়েই থাকে ছোটবাবু, এর জন্যে আপনি একটুও ভয় পাবেন না। খুড়ো আর ভাইপো—নলিন কি আর আপনার কাছে এই ক-হাজার টাকার দাবি করতে যাবে?"

নলিন দাবি করুক আর না করুক, 'বৈদ্যনাথের এই উদারতাটুকু কিন্তু প্রিয়নাথের অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি সালিসী দ্বারা জমিদারী ভাগ করিয়া লইলেন এবং একটা মহাল বিক্রয় করিয়া নলিনের অংশের টাকাটা ফেলিয়া দিলেন।

ভাগাভাগী পর্য্যন্ত শ্যামাসুন্দরী চুপ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রিয়নাথ যখন মহাল বিক্রয় করিলেন তখন তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না; তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "একটা নতুন মহাল করবার ক্ষমতা নেই, অথচ পৈতৃক মহালটা বেচে ফেললে ঠাকুরপো?"

প্রিয়নাথ উত্তর করিলেন, "ঋণী হয়ে থাকার চেয়ে একটা মহাল যাওয়া লক্ষগুণে ভালো।"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "এই ঋণের জন্যে কেউ কি তোমার ওপর জুলুম করেছিল?"

রুক্ষ ভাবে সতেজকণ্ঠে প্রিয়নাথ বলিলেন, "রমানাথ মল্লিকের ভাইয়ের ওপর জুলুম করবে এমন মানুষ এ-গ্রামে এখনও জন্মায়নি বোধ হয়।"

শ্লেষতীব্রকণ্ঠে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তাই তুমি জমিদারী বেচে সেই ভাইয়ের মুখ উজ্জ্বল করলে ?"

সহসা এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলেও, মহাল বিক্রয়ের জন্য প্রিয়নাথ একটুও লজ্জা বা দুঃখ অনুভব করিলেন না। বরং বৈদ্যনাথের উদারতার উপযুক্ত উত্তর দিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া সন্তোষ বোধ করিলেন।

নদীর বাঁধের মতন সংসারে একবার ভাঙন ধরিলে সে বাঁধ আর বেশী দিন টিকে না। জমিদারী বিভাগের পর হইতেই কথায়-কথায় ভাগাভাগির কথা উঠিয়া সংসারটাকে যেন অশান্তিময় করিয়া তুলিল। সামান্য-সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ বাধিতে দেখিয়া শ্যামাসুন্দরী বিরক্ত হইয়া একদিন প্রিয়নাথকে স্পষ্ট বলিলেন যে, "ভাগের পথ যখন একবার দেখিয়েছো ঠাকুরপো, তখন ভাঙা ঘরে মিছে গোঁজা দিয়ে আর বেশী দিন চলবে না।"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "তাহ'লে ভাঙা ঘরের জায়গায় কি নতুন ঘর গড়তে বলো ?"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "হ্যাঁ। এমন অশান্তিতে আর এক বাড়ীতে বাস করা চলে না। এখন হয় তুমি এ-বাড়ী ছাড়ো, না হয় আমরা ছাড়ি।"

একটুও না ভাবিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "নলিন ছেলেমানুষ, তার আর বাড়ী ছেড়ে কাজ নেই বৌঠান, আমিই বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।"

কাছারীবাড়ীর কিছু দূরে একখানা পুরাতন বাড়ী কেনা ছিল, মেরামত করিয়া প্রিয়নাথ সেই বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন।

শ্যামাসুন্দরী নিজে মধ্যস্থ থাকিয়া ঘরের জিনিসপত্র সব চুলচেরা ভাগ করিয়া দিয়া শুধু একটা জিনিস চাহিলেন, প্রিয়নাথের বড় ছেলে—রাধুকে। তিনি আঁতুড়ঘর হইতেই রাধুকে মানুষ করিয়া আসিতেছেন। রাধুও গর্ভধারিণীর চেয়ে বড়মাকেই বেশী চিনিত। বড়মা হাতে করিয়া না খাওয়াইয়া দিলে তার খাওয়া হইত না, বড়মার কাছে না শুইলে সে ঘুমাইতে পারিত না। তার আদর-আব্দার যা-কিছু সব বড়মায়ের কাছে—মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। কাজেই প্রিয়নাথ যখন নূতন বাড়ীতে উঠিয়া চলিলেন তখন শ্যামাসুন্দরী রাধুকে তাঁর কাছে রাখিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন ; রাধুও বড়মাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে চাহিল না। প্রিয়নাথ কিন্তু বৌদির অনুরোধ আর তাঁর কাছে থাকিবার জন্য রাধুর ব্যাকুলতা কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না—ব্যাধ যেমন জল্লাদের মতন নিষ্ঠুর হইয়া মৃগীর কোল হইতে মৃগশিশুকে কাড়িয়া লইয়া যায়, প্রিয়নাথও তেমনি শ্যামাসুন্দরীর সকাতর অনুরোধ ও রোরুদ্যমান বালকের আন্তরিক ব্যাকুলতাকে উপেক্ষা করিয়া রাধুকে লইয়া চলিয়া গেলেন। নিরুপায় শ্যামাসুন্দরী শুধু বেদনাবিহ্বল-হৃদয়ে নিঃশব্দে বসিয়া প্রিয়নাথের এই অমানুষিক নির্মমতা সহ্য করিলেন।

তারপর যাত্রার সময় ছোটবৌ আন্নাকালী যখন বলিল, "তাহ'লে লক্ষ্মীর কি হবে দিদি ?"

স্তব্ধ আগ্নেয়গিরির আকস্মিক বিদারণের মতন গর্জ্জন করিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "কি আর হবে,—কেটে-কুটে লক্ষ্মীকে ভাগ ক'রে নিয়ে যাও !"

লক্ষ্মীকে কি করিয়া ভাগ করিয়া লইবে বুঝিতে না পারিয়া আন্নাকালী আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে দিদির ক্রোধগম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে শান্ত হইয়া শ্যামাসুন্দরী ছোটবৌকে বুঝাইয়া দিলেন যে, লক্ষ্মীর ভাগ হইতে পারে না ; ইচ্ছা করিলে তারা নূতন বাড়ীতে গিয়া নূতন লক্ষ্মী পাতিয়া লইতে পারিবে, কিন্তু তিনি বাঁচিয়া থাকিতে মল্লিকগোষ্ঠীর লক্ষ্মীকে বাড়ীর বাহিরে যাইতে দিবেন না।

সেদিন রাত্রে আন্নাকালী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, লক্ষ্মী না পাইলে—লক্ষ্মীহীন নূতন বাড়ীতে যাইয়া কি করিয়া বাস করিবে ?

অগত্যা পরদিন প্রাতে প্রিয়নাথ নিজে গিয়া লক্ষ্মীর কৌটার ভাগ চাহিলেন, কিন্তু শ্যামাসুন্দরী রাজী হইলেন না। শেষে লক্ষ্মীকে ছাড়িয়াই তাঁদের নূতন বাড়ীতে যাইতে হইল।

নূতন বাড়ীতে গিয়াও প্রিয়নাথ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। মালক্ষ্মীর জন্য আন্নাকালী যখন-তখন আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। স্ত্রীর সেই

অধীরতা নিবারণের কোনো উপায় করিতে না পারিয়া প্রিয়নাথ ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য একটা বাগানের সীমানা লইয়া বর-তরফের সঙ্গে এমন বিরোধ বাধাইয়া দিলেন যে, সে বিবাদের ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা মামলা-মোকদ্দমা কিছুই বাকি রহিল না। অনেক রক্তপাত, অনেক অর্থব্যয়, অনেক লড়ালড়ির পর শেষে প্রিয়নাথই জয়লাভ করিলেন—দুইটি বাগানের মধ্যবর্ত্তী এক হাত পরিমাণ আগাছাপূর্ণ জলনালীটা তাঁর অধিকারে আসিল। দুই হাজার টাকা ব্যয়ে এই জলনালীটুকু অধিকার করিয়া প্রিয়নাথ ঢাক-ঢোল বাজাইয়া বিপুল সমারোহে জয়কালীর পূজা দিলেন ও বিরাট এক ভোজ দিয়া বন্ধুবান্ধবদের সন্তুষ্ট করিলেন।

কিন্তু এই বিজয়েই জয়-পরাজয়ের সীমা নির্ণীত হইল না। বরং এই ক্ষুদ্র নালীটুকুর জন্য যে আগুন জ্বলিল, সমস্ত জমিদারী দগ্ধ করিয়াও তা নিবিল না। এক-একটা বিষয় লইয়া নম্বরের পর নম্বর মোকদ্দমা চলিতে লাগিল ও তার সঙ্গে এক-একটা মহালের বিক্রয় ও বন্ধকী-কোবালা লেখা হইতে থাকিল। শুধু তাই নয়—জমিদারদের ঘরোয়া-বিবাদের সুযোগ লইয়া প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল আর দুটি বিপক্ষ পক্ষের প্ররোচনায়, দুই পক্ষেরই খাজনা বন্ধ করিয়া দিল। আয়ের পথ সঙ্কীর্ণ আর ব্যয়ের পথ প্রশস্ত হইলে যা ঘটে এক্ষেত্রে তাই ঘটিল—ঋণের ভারে উভয় পক্ষই জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল। তবে বৈদ্যনাথের দক্ষতাগুণে বড়-তরফ একেবারে সর্ব্বস্বান্ত

হইল না, কিন্তু প্রিয়নাথ নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন—এমনকি, বাগানের গাছকাটা-মোকদ্দমায় স্ত্রীর শেষ অলঙ্কারখানি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া যেদিন পরাজয়ের অপমান ও দুই হাজার টাকা খরচার দায়ী হইয়া ঘরে ফিরিলেন সেদিন তাঁর আহারের সংস্থানটুকুও ঘরে ছিল না। সেদিন বড়-তরফের ঠাকুরঘরের কুলঙ্গীতে বসিয়া মালক্ষ্মী হাসিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না, কিন্তু শ্রীমান্ নলিনচন্দ্রের বৈঠকখানায় যে হাস্যের প্রবল তরঙ্গ উঠিয়াছিল তা বাহির-বাড়ীর সীমা অতিক্রম করিয়া অন্দরে শ্যামাসুন্দরীকে পর্য্যন্ত চমকিত করিয়া তুলিয়াছিল।

*

*   *

—"বড়মা !"

—"কে রে, রাধু এসেছিস্ ?"

শ্যামাসুন্দরী আহ্নিক করিতে বসিয়াছিলেন, দারুণ উৎসাহে ও আনন্দে আহ্নিক ছাড়িয়া উঠিয়া ত্রস্ত ভাবে বলিলেন, "হঠাৎ কি মনে ক'রে এলি রে রাধু ?"

রাধু বলিল, "তোমাকে দেখতে এলাম বড়মা।"

হাস্যপ্রফুল্লমুখে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "আয় আয়, বোস্। এতদিন আসিস্ নি কেন রে ?"

রাধু বসিল না। নতমুখে দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

উদ্বিগ্নকণ্ঠে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তোর বাবা বুঝি তোকে বারণ করেছিল ?"

সলজ্জমুখে রাধু উত্তর দিল, "না।"

—"তবে আসিস্ নি কেন ?"

—"এসেছিলাম।"

—"কার কাছে এসেছিলি ?"

—"তোমার কাছে।"

আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "আমার কাছে আবার কবে এলি রে রাধু ?"

সতর্কদৃষ্টিতে পিছন দিকে চাহিয়া রাধু শঙ্কিতস্বরে বলিল, "অনেক দিন এসেছিলাম বড়মা, কিন্তু তোমার কাছে আস্তে দেয় নি।"

শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আস্তে দেয় নি ?"

রাধু বলিল, "মামাবাবু দেয় নি—দাদাবাবুও দেয় নি !"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "কেন আসতে দেয় নি রে ? কি বলে ওরা ?"

রাধু বলিল, "বলে, তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, তুমি বাড়ীতে নেই।"

গম্ভীরমুখে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "বটে !"

রাধু বলিল, "একদিন দাদাবাবু আমার কাণ ম'লে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সেইদিন থেকে আমি আর আসি নি।"

রাধুর চোখ দুইটা ছলছল করিতে লাগিল।

রাগে শ্যামাসুন্দরীর 'মুখখানা আরক্ত আর কপালের শিরাগুলা স্ফীত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে থাকিবার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আজ যে বড় এলি ?"

—"আজ কেউ কোথাও নেই দেখে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি বড়মা।" বলিয়া রাধু একটু ম্লানহাসি হাসিল।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "এত লুকোচুরি ক'রে কেন এলি রে ?"

রাধু মাথা নীচু করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

তার মুখের উপর সহাস্যদৃষ্টি রাখিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "আমাকে দেখতে এসেছিস্ বুঝি ?"

মাথা নাড়িয়া রাধু বলিল, "না।"

শ্যামাসুন্দরীর হর্ষপ্রফুল্ল মুখের উপর কে যেন কালি মাখাইয়া দিল···ম্লানমুখে বলিলেন, "একটু আগে যে বল্লি ?"

রাধু নিরুত্তর। তার মলিনমুখের দিকে চাহিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "চুপ ক'রে রইলি যে ? ···মুখখানা তোর অমন শুক্নো কেন রে ! খাওয়া হয়েছে ?"

নতমুখে মাটির দিকে চাহিয়া রাধু বলিল, "না।"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "এতখানি বেলা হয়েছে এখনো খাওয়া হয় নি ? তোর মা কি করছে ?"

রাধুর উত্তর নাই। জলভরা দৃষ্টিটা শুধু একবার বড়মার মুখের দিকে তুলিয়াই সে আবার নামাইয়া লইল।

তার ভাবভঙ্গী দেখিয়া শ্যামাসুন্দরী বিস্মিত হইলেন এবং

খুব কাছে সরিয়া আসিয়া মাথার উপর হাত রাখিয়া স্নিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে রে রাধু ?"

সে স্নেহসম্ভাষণে রাধুর সজল চক্ষু দুইটি অশ্রুভারে টল্‌টল্‌ করিতে-করিতে সহসা ফোঁটা ফোঁটা করিয়া গালের উপর গড়াইতে লাগিল।

শ্যামাসুন্দরী রাধুর এই অহেতুক কান্নার কারণ না বুঝিলেও তার চোখে জল দেখিয়াই আঁচল দিয়া মুছাইতে-মুছাইতে অশ্রুগাঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "আবার কাঁদে—কি হয়েছে বল্‌ না ?"

কি যে হইয়াছে রাধু বলিতে পারিল না, বড়মার এই সস্নেহ-প্রশ্নে সে শুধু ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শ্যামাসুন্দরী দুই হাতে তার মাথাটা টানিয়া আনিয়া কোলের উপর চাপিয়া ধরিলেন।

ঠিক সেইসময় বৈদ্যনাথ আসিয়া হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে বলিলেন, "ছোটবাবুর ব্যাপার শুনেছো শ্যামা ?"

চম্‌কাইয়া উঠিয়া শ্যামাসুন্দরী ফিরিয়া চাহিলেন।

বৈদ্যনাথ আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন···রাধুর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই হঠাৎ থামিয়া গেলেন।

উৎকণ্ঠিত ভাবে শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে দাদা ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন, "না, এমন কিছু নয় ; তবে শুনলুম তিনি নাকি বাড়ীটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন।"

—"কেন যাচ্ছে ?"

"না গেলে থাকবেন কোথায় ?"

—"এখন কোথায় আছে ?"

—"এখন তো আছেন নিজের বাড়ীতেই। কিন্তু বাড়ীখানা তো বেশী দিন নিজস্ব থাকবে না ?"

—"কেন ?"

—"আপীলের মামলায় আমরা যে খরচার ডিক্রী পেয়েছি, সে ডিক্রী জারি করলে ঐ বাড়ীখানা ছাড়া ক্রোক দেবার আর কিছু নেই।"…

…ক্রোক দিয়া বাড়ীখানাকে নিলামে ডাকিয়া লওয়া হইবে এই অপমানের আশঙ্কায় প্রিয়নাথ দিন থাকিতে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে…

শ্যামাসুন্দরী রাধুর মাথার চুলের ভিতর আঙুল চালাইতে-চালাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা ডিক্রী জারি করেছো ?"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "জারি এখনো করা হয় নি, তবে শীগগির করতে হবে।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "যদি জারি না করা হয় ?"

বিস্ময়ের ভাব গোপন করিয়া বৈদ্যনাথ উত্তর দিলেন, "ডিক্রীর টাকাগুলো ছেড়ে দিলে আর জারি করতে হবে না।"

শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত টাকা ছাড়তে হবে?"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "সতেরো-শো।"

—"সতেরো-শো টাকা কি ছাড়া যায় না ?"

—"ছেড়ে দিলে দু'চার লাখ ছাড়া যায়, সতেরো-শো তো তুচ্ছ !"

শ্যামাসুন্দরী নীরব।

বৈদ্যনাথ তাঁর চিন্তাগম্ভীরমুখের দিকে চাহিয়া মনের ইচ্ছা জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহ'লে টাকাটা ছেড়ে দেওয়াই কি তোমার মত ?"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "ছেড়ে দিলে ভালো হয় না কি ?"

শ্লেষের হাসি হাসিয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন, "তা ছোটবাবুর পক্ষে খুব সুবিধা হয় বৈকি।"

গম্ভীরমুখে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "আমি ভাবছি কি জানো, প্রিয় মল্লিকের বাড়ী বিক্রি হ'লে তাতে শুধু তার অপমান নয় ; লোকে বলবে, অমুক মল্লিকের ভাইয়ের বাড়ী নিলামে উঠলো। সেটা আমাদের পক্ষেও খুব প্রশংসার কথা নয় দাদা।"

মৃদু হাসিয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন, "ছোটবাবু যখন রাধুকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন তখনই বোঝা গেছে—"।

বড়মার কোল হইতে সহসা মাথা তুলিয়া রাধু বলিয়া উঠিল, "না না, বাবা আমাকে আসতে বলবেন কেন, আমি তো নিজেই লুকিয়ে বড়মার কাছে পালিয়ে এসেছি !"

সে-কথায় কাণ না দিয়া বৈদ্যনাথ ভগ্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, নলিনকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে তোমাকে বলবো।"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তাকে এ-কথা জিজ্ঞাসা না করলে হবে না?"

গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িতে-নাড়িতে বৈদ্যনাথ বলিলেন, "হলেও তার মত না নিয়ে কোনো কাজ করা ভালো নয়। কারণ সে এখন সাবালক।"

শ্যামাসুন্দরী আর কিছু বলিলেন না।

রাধুর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিতে-চাহিতে বৈদ্যনাথ চলিয়া গেলেন।

শ্যামাসুন্দরী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর, "আয়" বলিয়া রাধুর হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন।

*

* *

ঘরে গিয়া রাধুকে খাইতে দিয়া শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে রাধু, বড়মা না হ'লে তো তোর একদণ্ড চলতো না। তবে সেই বড়মাকে ছেড়ে এ্যাদ্দিন তুই কি ক'রে ছিলি রে? তোর মন কেমন করতো না?"

নতমুখে একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া রাধু বলিল, "প্রথম-প্রথম খুব মন কেমন করতো বড়মা, যখন-তখন আমার 'খালি কান্না পেতো!"

হাস্যপ্রফুল্লস্বরে শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর?"

রাধু বলিল, "তারপর আর কান্না পেতো না, শুধু এক-একবার তোমার কাছে আসবার ইচ্ছে হতো।"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "বেশী নয়, মোটে এক-একবার? ওরে নেমকহারাম! তোরা যাবার পর যে আমি তিন দিন মুখে জল পর্য্যন্ত দিই নি!"

রাধু জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বড়মা?"

বেদনাগম্ভীরস্বরে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "কেন দিই নি তা আর তোরা কি জান্‌বি বল্‌! জান্‌লে কি আর এমনি ক'রে চলে যেতে পারতিস্‌?"

ঘাড় দোলাইয়া রাধু এবার জোরগলায় বলিল, "হ্যাঁ, আমরা চলে গিয়েছিলাম বৈকি। তুমিই তো আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলে!"

চম্‌কাইয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "আমি! আমি তাড়িয়ে দিয়েছি? কে এমন কথা বলে রে?"

রাধু বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলিল, "সক্কলেই তো বলে বড়মা। ইস্কুলের ছেলেরা পর্য্যন্ত এই নিয়ে রোজ আমায় রাগায়।"

—"কি বলে তারা?"

—"বলে, বাবা চুরি করেছে ব'লে তুমি আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছো।"

—"তোর বাবা কি বলে?"

—"বাবা? ...বাবা কিছু বলে না।"

—"তোর মা?"

—"মা শুধু কাঁদে।"

—"আমাকে খুব গাল দেয় ?"

ঘাড় নাড়িয়া রাধু বলিল, "না না, তোমাকে গাল দেবে কেন ? তুমি তো আর সত্যি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও নি !"

—"তুই কি ক'রে জানলি যে, সত্যি তাড়িয়ে দিই নি ?"

—"সে আমি জানি। ...তুমি বুঝি আমাদের তাড়াতে পারো ?"

শ্যামাসুন্দরীর মুখে সহসা গাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িল। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তাড়িয়ে যে দিই নি এমন কথাও বল্‌তে পারি না বাছা। আমি বলেছিলাম, হয় তুমি যাও, না হয় আমি যাই। তা, ঠাকুরপো আমাকে আর কোন্ লজ্জায় যেতে দেবে, কাজেই নিজে চলে গেল।"

চাপিবার চেষ্টাসত্ত্বেও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকটাকে কাঁপাইয়া জোরে বাহির হইয়া গেল। সেটাকে ঢাকিবার অভিপ্রায়ে শ্যামাসুন্দরী ম্লানহাসি হাসিয়া বলিলেন, "তা, বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার শোধও ঠাকুরপো আমাকে কম দেয় নি ! মামলা-মোকদ্দমা, শত্রুতা যতদূর করবার করেছে। তারপর এখন আবার বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছে শুন্‌ছি।"

রাধু হেঁটমুখে বসিয়া চুপ করিয়া খাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে বড়মা ডাকিলেন, "হ্যাঁরে রাধু !"

রাধু মুখ তুলিল।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "সত্যিই কি তোর বাবা চলে যাবে ?"

রাধু উত্তর করিল, "হ্যাঁ বড়মা।"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তুইও যাবি ?"

রাধু এবার মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

তার মুখের উপর স্নেহপ্রফুল্লদৃষ্টি রাখিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "ওরা যায় যাক্, তুই কেন আমার কাছে থাক্ না ?"

রাধু মাথা নীচু করিল।

শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, বল্ না। থাক্‌বি ?"

রাধু একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, "থাক্‌তে পারি বড়মা, কিন্তু—"

—"কিন্তু তোর বাবা থাক্‌তে দেবে না, না ?"

রাধু নীরবে ঘাড় নাড়িল।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "কেন থাক্‌তে দেবে না রে ? আমি কি এতই পর হয়ে গেছি ?"

এ-কথার কি উত্তর দিবে রাধু বুঝিতে পারিল না।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "কিন্তু তোর বাবাকে বলিস্ রাধু, সে আমাকে যতটা শত্রু মনে করে, সত্যি আমি ততটা শত্রু নই তার।" বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন।

রাধু কি বলিতে যাইতেছিল, সেই সময় নলিন মাকে ডাকিতে-ডাকিতে আসিয়াই রাধুকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

শ্যামাসুন্দরী তার দিকে ফিরিয়া সহাস্যে বলিলেন, "কে এসেছে দেখেছিস্ নলিন ?"

তীব্রদৃষ্টিতে রাধুর দিকে চাহিয়া নলিন ভারীমুখে বলিল, "দেখছি তো। কিন্তু ও কেন এসেছে ?"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "বাড়ী ছেড়ে ওরা এখান থেকে চলে যাবে কিনা, তাই আমাকে দেখতে এসেছে।"

রুক্ষস্বরে নলিন বলিল, "তোমাকে দেখতে এসেছে, না তোমার কাছে ভিক্ষে করতে এসেছে ?"

ত্রস্ত ভাবে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "ভিক্ষে ! ভিক্ষে করতে আস্‌বে কেন রে ?"

তীব্রকণ্ঠে নলিন বলিল, "আসবে না তো কি ? ওদের এখন দিন চলে না তাই কাকাবাবু নিজে না আসতে পেরে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে। ও রাস্কেলটা যে আরও ক'দিন এসেছিল !"

গম্ভীরমুখে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "আর তুই ওর কাণ ম'লে তাড়িয়ে দিয়েছিলি।"

রাগে মুখ লাল করিয়া নলিন বলিল, "দিয়েছিই তো। ইষ্টুপিড্ বুঝি তোমায় বলেছে ?"

বলিয়া সে রাধুর মুখের দিকে কি একরকম চোখে চাহিল। সে রক্তচক্ষু দেখিয়া রাধু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বড়মার কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল।

পুত্রের এই ঔদ্ধত্যে শ্যামাসুন্দরী বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, "ও সত্যি কথাই বলেছে। বরং তোর কাজটাই ঠিক হয় নি।"

মাটিতে পা ঠুকিয়া নলিন বলিল, "না, হয় নি—আলবৎ

ঠিক হয়েছে। সেদিন কাণ ধ'রে তাড়িয়ে দিয়েছি, আজ ঘাড় ধ'রে বের ক'রে দেবো।"

বলিয়া সে আস্তিন গুটাইতে-গুটাইতে রাধুর দিকে আগাইয়া গেল।

পুত্রের দিকে জ্বলন্তদৃষ্টিতে চাহিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে শ্যামাসুন্দরী ডাকিলেন, "নলিন?"

সে বজ্রকঠোর আহ্বানে চম্‌কাইয়া নলিন থমকিয়া থামিতেই শ্যামাসুন্দরী ক্রোধপরুষকণ্ঠে বলিলেন, "আমার সাম্‌নে তুই রাধুর ঘাড় ধর্‌বি?"

—"শুধু ঘাড় ধরবো না, চাবুক মেরে ওকে ঢিট্ করবো।"

—"ওর অপরাধ?"

—"ও কেন আমার বাড়ীতে ঢুকেছে?"

—"বাড়ী কি শুধু তোর? আমার এতে অধিকার নেই?"

—"থাকলেও তুমি আমার মা।"

—"আমি যেমন তোর মা, ওরও তেমনি বড়মা।"

কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া থাকিয়া নলিন বলিল, "তাই বুঝি ওরা আমাদের নিন্দে ক'রে বেড়ায়?"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "নিন্দের কাজ করলেই সবাই নিন্দে করে; সুখ্যাতির কাজ করলে কি কেউ আর নিন্দে করতে পারে?"

নলিন বলিল, "কি এমন নিন্দের কাজ করেছি আমরা?"

—"যা করেছি তা মানুষ পারে না। একজনকে তার পৈতৃক ভিটে থেকে তাড়িয়ে দেওয়া কি কম অন্যায়? তুই ছেলে মানুষ কি বুঝবি?"

—"বোঝাবুঝি আবার কি? কাকাবাবু তো নিজেই চলে গিয়েছে।"

—"ইচ্ছে ক'রে কেউ বাপের ভিটে ছেড়ে চলে যায় না। তবুও যে কেন ঠাকুরপো গিয়েছে তা বুঝি ব'লেই ওদের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে।"

—"তোমার প্রাণ কাঁদে, তুমি ওদের ভালোবাসো ব'লে।"

—"আপনার লোককে ভালোবাসাটা অন্যায়, না?"

—"আর আপনার লোক যে শত্রুতা করে সেটা বুঝি খুব ন্যায় কাজ?"

শ্যামাসুন্দরী গম্ভীর ভাবে ভ্রূকুটী করিলেন। তাঁর সে ভ্রূকুটীকে গ্রাহ্য না করিয়াই রাধুর দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া নলিন বলিল, "বাপ রেগুলার শত্রুতা করছে আর ছেলে এসেছে তোমার কাছে ভালোবাসা আদায় করতে! মন্দ নয়।"

শ্যামাসুন্দরী পুত্রের মুখের উপর এবার তিরস্কারের দৃষ্টিতে চাহিলেন।

নলিন সে চাহনিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অন্য কথা পাড়িল; বলিল, "ডিক্রীর টাকাগুলো তুমি নাকি ছেড়ে দেবে বলেছো?"

গম্ভীর ভাবে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "হ্যাঁ, বলেছি।"

মুখ বিকৃত করিয়া নলিন বলিল, "বলেছো ব'লে টাকাগুলো ছেড়ে দিতে হবে নাকি ?"

—"হ্যা, হবে।"

—"কেন ?"

শ্যামাসুন্দরীর রাগ হইল ; বলিলেন, "আমি না তোর মা ? আমার কাছে কৈফিয়ত চাইতে তোর লজ্জা হচ্ছে না ?"

মায়ের তিরস্কারে নলিন ভয় পাইল না···রাগে মুখটা লাল করিয়া রাধুর দিকে একবার চাহিয়াই মা'র দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "মা ব'লে কি তুমি সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দেবে ?"

গর্জ্জন করিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "হ্যাঁ, দেবো। তুই আট্‌কে রাখতে পারবি ?"

—"পারি কি না দেখিয়ে দেবো···"

বলিয়া রাগে গসগস করিতে-করিতে সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

রাধু এতক্ষণ হাত গুটাইয়া বসিয়াছিল। নলিন চলিয়া যাইবার পর শ্যামাসুন্দরীর ক্রোধগম্ভীরমুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দাদাবাবু বড্ড রেগে গেছে বড়মা।"

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে মুখটা ফিরাইয়া লইয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "রাগুক্‌গে, তুই খেয়ে নে।"

বড়মার রাগ দেখিয়া রাধু শঙ্কিত হইল এবং আর কোনো কথা না বলিয়া মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিতে-চাহিতে খাইতে লাগিল।

ওর এই শঙ্কিত ভাব দেখিয়া শ্যামাসুন্দরীর হাসি আসিল ; বলিলেন, "তোর ভয় হয়েছে নাকি রে রাধু ?"

রাধু বলিল, "ভয় একটু হয়েছে বড়মা, আর—আর বড্ড লজ্জা করছে !"

মৃদু ভর্ৎসনার সুরে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "ঈস্, একরত্তি ছেলের লজ্জা দেখে আর বাঁচি না !"

বড়মার এই সস্নেহ-তিরস্কারে রাধু হাসিয়া ফেলিল।

*

* *

—"শুনেছো ছোটবৌ ?"

দারুণ আগ্রহে আন্নাকালী জিজ্ঞাসা করিল, "কি গা ?"

প্রিয়নাথ একটু হাসিয়া বলিলেন, "বড়গিন্নীর এবার আমাদের ওপর দয়া হয়েছে।"

বিস্ময়ের ভঙ্গীতে মুখ তুলিয়া আন্নাকালী জিজ্ঞাসা করিল, "কি-রকম দয়া ?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "মাছ মরলে বেরালের মনে যে-রকম দয়া হয়।"

কিছু বুঝিতে না পারিয়া আন্নাকালী অবাক্‌বিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রিয়নাথ বলিলেন, "খরচার ডিক্রীর টাকাটা তিনি নাকি আমাদের ছেড়ে দেবেন।"

সাগ্রহে আন্নাকালী বলিল, "ছেড়ে দেবেন ?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, সর্ব্বস্বান্ত করেও মনস্কামনা সিদ্ধ হয়নি তাই এবার দয়া দেখিয়ে সেটা সিদ্ধ করবেন।"

আন্নাকালী নতমুখে দাঁড়াইয়া হাতের আঙুল মট্‌কাইতে লাগিল।

প্রিয়নাথ একমনে তামাক টানিতে-টানিতে হঠাৎ স্ত্রীর দিকে চাহিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "শুনে তোমার খুব আমোদ হচ্ছে, না ?"

এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে আন্নাকালী সঙ্কুচিত হইল। স্বামীর এই হাসিটুকুর মধ্যে গভীর বেদনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বুঝিয়া খুব ব্যথা পাইল।

প্রিয়নাথ বলিলেন, "যাক্, তবু বড়গিন্নীর দয়ায় বাড়ীটা ছাড়তে হলো না। বড্ডই ভাবনা হয়েছিল ছোটবৌ, যে, বাড়ী ছেড়ে কোথায় দাঁড়াবো !"

আন্নাকালী বলিল, "কোথায় দাঁড়াবে কেন, দাঁড়াবার জায়গা তো ঠিক করেছো।"

ম্লানহাসি হাসিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "ঠিক তো করেছি, কিন্তু কি-রকম জায়গা ঠিক করেছি জানো ?"

আন্নাকালী জিজ্ঞাসা করিল, "কি-রকম ?"

প্রিয়নাথ জবাব দিলেন, "লোকের গরু-ছাগলও তার চেয়ে ভালো জায়গায় থাকে।"

আন্নাকালী বলিল, "এত খারাপ ?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "হ্যাঁ। সে বাড়ীতে তুমি এক দণ্ড টিকতে পারবে কি না সন্দেহ।"

আন্নাকালী বলিল, "আমি পারলেও, তুমি পারবে না।"

একটু হাসিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "কে পারবে কে না পারবে সেটা পরীক্ষা করবার সুযোগ বড়গিন্নী আর দিলেন কৈ? যাক্, ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন। বড়গিন্নী এদিকে যাই হোক্, দয়া তাঁর যথেষ্ট আছে এটা স্বীকার করতেই হবে।"

বলিয়া প্রিয়নাথ স্ত্রীর মুখের দিকে চাইলেন।

মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া আন্নাকালী বলিল, "কিন্তু দুক্‌খু এই যে, তাঁর সে দয়াটুকু তুমি নিতে পারো না!"

আশ্চর্য্যের ভাব দেখাইয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "আমি নিতে পারি না? তুমি ভুল বুঝেছো ছোটবৌ, আমি এখন সব পারি।"

—"পারো?"

—"না পারলে আর এ-ক'দিন খেতে পেতাম কোথা থেকে? বড়গিন্নী যদি রাধুর হাত দিয়ে সাহায্য না পাঠাতো তাহ'লে যে আমাকে উপোস দিয়ে দিন কাটাতে হতো!"

আন্নাকালীর মুখ শুকাইয়া গেল। বড়গিন্নী যে গোপনে অর্থ সাহায্য করিতেছে এবং সেই প্রাপ্ত-অর্থ তার নিজের লুকানো সঞ্চয় বলিয়া এতদিন স্বামীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও ভিতরের আসল কথাটা তিনি বুঝিয়া লইয়াছেন, এই কথাটা মনে হইতেই আন্নাকালী লজ্জায় আর স্বামীর দিকে মুখ তুলিতে পারিল না।

স্ত্রীর এই সলজ্জ ভাব লক্ষ্য করিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "মানুষের তেজ অহঙ্কার ততদিন থাকে ছোটবৌ, যতদিন তার অর্থবল থাকে। কিন্তু অভাবের তাড়নায় তার গর্ব্ব অভিমান সব লোপ পেয়ে যায়!"

লজ্জারক্তমুখে আন্নাকালী বলিল, "আমাকে মাপ করো, আমি বুঝতে পারি নি।"

গম্ভীরকণ্ঠে প্রিয়নাথ বলিলেন, "বুঝতে তুমি খুবই পেরেছিলে, শুধু উপোসী স্বামী-পুত্রের মুখে এক মুঠো অন্ন দেবার লোভ সামলাতে পারো নি।"

কাতরকণ্ঠে আন্নাকালী বলিল, "আমার অপরাধ হয়েছে।"

সহাস্য-সান্ত্বনার স্বরে প্রিয়নাথ বলিলেন, "না, অপরাধ তোমার এমন হয়নি যা মেয়েমানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাকে ছাপিয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমার দুর্ব্বলতাটাই বেশী।"

নিজের দুর্ব্বলতার তুলনা দিয়া প্রিয়নাথ স্ত্রীর অপরাধটা ঢাকিবার চেষ্টা করিলেও আন্নাকালী আপনাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ভাবিতে পারিল না; বরং স্বামীর এই অতিরিক্ত উদারতায় লজ্জা পাইয়া অপরাধীর মতন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রিয়নাথ গম্ভীর ভাবে হুঁকায় টান দিতে দিতে স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে?"

আন্নাকালীর মুখে কথা নাই। নতমুখে দাঁড়াইয়া সে আঁচলের খুঁটটা লইয়া নাড়িতে লাগিল।

প্রিয়নাথ অন্য কথা পাড়িলেন ; বলিলেন, "ঘরে নুন-তেল আছে তো ?"

আন্নাকালী বলিল, "যা আছে আজ চল্‌বে।"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "তাহ'লে বোধহয় চাল নেই ?"

বিমর্ষমুখে আন্নাকালী বলিল, "চাল যা ছিল, কাল রাতটাই অনেক কষ্টে চলেছে।"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "কালকের মতন আজকের দিনটাও চলে না ?"

আন্নাকালী নীরব।

প্রিয়নাথ এবার গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আজ আর চাল আনবার কোনো উপায় নেই তা জানো ?"

—"জানি।"

—"জানো যদি তবে চুপ ক'রে রইলে কেন ? একটা দিন কি কোন-রকমে চলে না ?"

—"উপোস দিলে চল্‌তে পারে।"

—"তাই দাও।"

—"তুমি-আমি উপোস দিতে পারি, কিন্তু ছেলে-মেয়েরা ?" ভ্রূকুটী করিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "পারবে না ব'লে কি তাদের জন্যে চুরি ডাকাতি করতে যাবো ?"

আন্নাকালী এ-কথারও উত্তর দিতে পারিল না।

প্রিয়নাথ বলিলেন, "যা হয় একটা বলো ?"

আন্নাকালী বলিল, "কি বলবো ?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "যুক্তি-পরামর্শ না দিতে পারো, দুটো ঝঙ্কারও তো দিতে পারো!"

অতি দুঃখেও এক-এক সময় যে হাসি আসে তেমনি এক টুক্‌রা মলিনহাসি ঠোঁটের কোলে আসিয়াই মিলাইয়া গেল। আন্নাকালী দীর্ঘ নিঃশ্বাসটাকে বুকে চাপিয়া ধীরে-ধীরে বলিল, "তোমার দোষ থাকলে হয়তো দিতাম।"

মুখভঙ্গী করিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "আমার দোষ নয় তো কার দোষ তুমি দেখলে? আমি জেদের বশে মামলা-মোকদ্দমা ক'রে স্ত্রী-পুত্রকে পথে বসাই নি?"

স্বামীর এই ক্রোধের মধ্যে একটা অনুতাপের বেদনা রহিয়াছে বুঝিয়া আন্নাকালী ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, "এত রাগ করছো কেন গো? তোমার কি দোষ? সবই আমাদের কপালে করেছে।"

মানুষের সকল শোক-সন্তাপ-দুঃখকষ্টের ইহাই শেষ সান্ত্বনা। কিন্তু এ সান্ত্বনা দিয়াও প্রিয়নাথ আজ আপনার দুঃখদৈন্যকাতর হৃদয়কে শান্ত করিতে পারিলেন না। স্ত্রীর পাংশু মুখ আর ক্ষুধার্ত্ত পুত্র-কন্যাদের আহার্য্য সংস্থানের অক্ষমতা আজ সকল সান্ত্বনাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া তাঁর অনুতপ্ত চিত্তকে নৈরাশ্যের কশাঘাতে এমনই জর্জ্জর করিয়া তুলিল যে, কিছুতেই তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। ...ওঃ, জমিদারের ছেলে—কত লোক তাঁদের খাইয়া মানুষ হইয়াছে, অথচ আজ তিনি নিজের ছেলে-মেয়েদের মুখে এক মুষ্টি ক্ষুধার অন্ন দিতে

পারেন না! যে লক্ষ্মীকে ঘরে আনিবার জন্য আজ তিনি লক্ষ্মীছাড়া, সেই লক্ষ্মী আজ তাঁর কাছ হইতে কত দূরে? ওঃ, দেবতা! এ কি তোমার নিষ্ঠুর পরিহাস!...

ক্ষোভে দুঃখে প্রিয়নাথের চোখ-মুখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল!

আন্নাকালী শঙ্কিত হইল; ধীর কোমলস্বরে বলিল, "এত রাগ করছো কেন—রাগলে কি কোনো উপায় হয়?"

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "তা হয় না জানি, কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকলেই কি উপায় আপনা হতে এসে পড়বে?"

আন্নাকালী বলিল, "তা আসবে না, তবে ভেবে-চিন্তে একটা উপায় তো করতে হবে!"

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "ভাববার আর কিছু নেই ছোটবৌ! সাত দিন সাত রাত ব'সে ভাবলেও পয়সা আপনি উড়ে আসবে না!"

—"আচ্ছা, কেউ দু'চার টাকা ধার দেয় না?"

হতাশার নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "টাকা দূরের কথা—দু'চারটে পয়সা দেয় কিনা সন্দেহ।"

এ সন্দেহের কথা আন্নাকালীও জানিত। সময় যখন ভালো ছিল তখন বিশ্বাস করিয়া অনেকে দু-চার হাজার টাকাও জমা রাখিতে আসিত, কিন্তু এখন—এই দুঃসময়ে দুইটা পয়সা দিয়া কেউ উপকার করিবে না। এমন একদিন ছিল, যখন আন্নাকালী

নিজে কত লোককে ছ-পাঁচ সের চাল বিলাইয়া দিয়াছে; কিন্তু সেদিন সে বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়াও আধ সের চাল ধার পায় নাই তাই স্বামীর সন্দেহ অমূলক নয় বুঝিয়া ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রিয়নাথ অগ্নিশূন্য-কলিকায় ক্রমাগত নিষ্ফল টান দিয়া ধোঁয়া বাহির করিতে না পারিয়া, বিরক্ত ভাবে হুঁকা রাখিয়া বলিলেন, "আমার চাদরখানা এনে দাও।"

আন্নাকালী জিজ্ঞাসা করিল, "এমন সময় চাদর কি হবে?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "ভয় নেই, চাদর গলায় বেঁধে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার প্রায়শ্চিত্ত করবো না! একবার ঘুরে দেখি যদি কোথাও কিছু পাই।"

আন্নাকালী চাদর আনিয়া দিল।

চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া প্রিয়নাথ উঠিবার উপক্রম করিতেই দরজায় পাল্কী-বেহারার কলরব শুনিয়া উভয়ে বিস্মিত ভাবে সেইদিকে চাহিলেন; দেখিলেন, তাঁদের বিস্মিত দৃষ্টিটাকে অতিরিক্ত বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া দিয়া শ্যামাসুন্দরী ধীর গম্ভীর-পায়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেছেন…

তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া আন্নাকালী অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

—"কর্ত্তা-গিন্নীতে মিলে কি পরামর্শ হচ্ছিলো গো ?"

বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টিটা ফিরাইয়া লইয়া প্রিয়নাথ নতমুখে মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

শ্যামাসুন্দরী দেবরের সামনে আসিয়া গম্ভীরমুখে বলিলেন, "আমাকে জব্দ করবার মতলব আঁটছিলে বোধহয়—না ? যাই হোক্, আচ্ছা শোধ তুমি নিয়েছো ঠাকুরপো।"

একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "শোধ আর নিতে পারলাম কৈ বৌঠান্, এ শুধু চোরের ওপর রাগ ক'রে মাটিতে ভাত খাওয়া হলো।"

সহাস্যে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "নির্ব্বোধ লোকের রাগের পরিণাম এইরকমই হয়ে থাকে।···ছোটগিন্নী ছুটলেন কোথায় ?"

বলিয়া তিনি ঘরের ভিতর দৃষ্টি দিতেই আন্নাকালী ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়াই শ্যামাসুন্দরীর হাত ধরিয়া আনিয়া দাবার উপর বসাইল।

ছোটবৌয়ের দিকে চাহিয়া তিরস্কারের সুরে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "এই যে, মড়ার কাঠটির মতন বেশ চেহারা হয়েছে দেখছি ; চেনবার উপায় নেই ! যেমন গিন্নীর চেহারা, কর্ত্তার চেহারাও ঠিক সেইরকম হয়েছে। সুখে-স্বচ্ছন্দে খাবার তরে যে

তাড়াতাড়ি আলাদা হয়ে এলি, তবে এমন আকার-প্রকার হলো কেন ? খেতে পাস্ না নাকি ?"

সদুঃখে প্রিয়নাথ বলিলেন, "সেটা বড় মিথ্যে নয় বৌঠান্। লক্ষ্মীছাড়া যারা তাদের অন্ন জুটবে কোথা থেকে ?"

প্রিয়নাথের এই উক্তির মধ্যে যে একটা লুকানো অনুযোগ ছিল তা বুঝিয়া লইতে শ্যামাসুন্দরীর দেরী হইল না। কিন্তু এই সত্য অনুযোগের কি উত্তর দিবেন তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

প্রিয়নাথ কাঁধের চাদরটা মাটিতে রাখিয়া চাপিয়া বসিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর ? হঠাৎ আজ কি মনে ক'রে এলে বৌঠান্ ?"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "ভেবো না, ঝগড়া করতে এসেছি। তোমাদের শোধ নিতে আর কত বাকি তাই জানতে এলাম।"

—"বাকি খুব অল্পই আছে।"

—"পৈতৃক ভিটেটুকু ছেড়ে যাওয়া বুঝি ?"

—"হ্যাঁ।"

—"ছেড়ে যাবে কোথায় ?"

—"যেখানে জোটে। এত-বড় সংসারে কি আর মাথা রাখবার ঠাঁই মিলবে না ?"

—"তা আর মিলবে না কেন ? 'খাট ভাঙলে ভুঁই শয্যা'... কোথাও না মিললে—গাছতলা তো আছে !"

—"ঘরের জ্বালার চেয়ে অনেক সময় গাছতলাতেই শান্তি পাওয়া যায়।"

—"ওটা তোমার ভুল। শান্তি বনে নেই, আছে—মনে। মনে কুটিলতা থাকলে কোথাও শান্তি পাওয়া যায় না।"

প্রিয়নাথ নীরবে একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

আন্নাকালীর দিকে চাহিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "কি লো, তুইও গাছতলায় গিয়ে শান্তি কুড়োবি নাকি?"

আন্নাকালী নিঃশব্দে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রিয়নাথ বলিলেন, "বাড়ীখানা তুমি নাকি আমাদের ছেড়ে দিতে চেয়েছো বৌঠান্?"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "কে বল্‌লে?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "কার আর নাম করবো—অনেকের মুখেই শুনেছি।"

—"ভুল শুনেছো।"

—"তা হতে পারে।"

—"হতে পারে কেন, নিশ্চয়ই তাই। এতটা দাতা আমি নই ঠাকুরপো, যে, এত-বড় বাড়ীখানা এক-কথায় ছেড়ে দিতে পারি। তা ছাড়া—ছাড়বোই-বা কেন? সামান্য একটা রাগের যে এত-বড় শোধ নিতে পারে তাকে দয়া করবার জন্যে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই।"

ম্লানহাসি হাসিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "তোমাকে আমি খুব চিনি বৌঠান্, তোমার মতন দয়ামায়াশূন্য মেয়েমানুষ জগতে আর দুটি নেই!"

শ্লেষতীব্রকণ্ঠে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তা ঠিক। জগতের যতকিছু দয়া-মায়া-স্নেহ-মমতা সব তোমারই একচেটে।"

অপ্রতিভ প্রিয়নাথ লজ্জায় মাথা নীচু করিলেন।

দেবরের লজ্জামলিনমুখের দিকে চাহিয়া শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহ'লে তোমরা বাড়ী ছেড়ে ঠিক যাচ্ছো ?"

প্রিয়নাথ মাথা নাড়িলেন—হ্যাঁ।

একটা ঢোঁক গিলিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "কিন্তু এখনও তো বাড়ী নিলাম হয়নি আর কেউ তোমাদের চলে যেতেও বল্‌ছে না!"

—"কেউ বলবার আগেই মানে-মানে যাওয়া ভালো।"

—"এত অপমানের ভয় তোমার ?"

জোরগলায় প্রিয়নাথ বলিলেন, "অপমানের ভয় প্রত্যেক ভদ্রলোকেরই আছে।"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "থাকাই উচিত, কিন্তু তোমার বোধহয় নেই। থাকলে তুমি এদের এমন ক'রে গাছতলায় বসাতে না।"

প্রিয়নাথ এ-কথার উত্তর দিতে পারিলেন না।

শ্যামাসুন্দরী তখন রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া আন্নাকালীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লো, দাঁড়িয়ে রইলি যে! রান্নাবান্না সব হয়ে গেছে নাকি ?"

আন্নাকালী উত্তর দিল, "না, হয় নি এখনো।"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "আর কখন্ হবে? এতখানি বেলা হলো এখনও উনুন জ্বলে নি, এর পর আর রান্না-খাওয়া হবে কখন্?"

কেন যে উনান জ্বলে নাই তা স্পষ্ট বলিতে না পারিয়া উপেক্ষার সুরে আন্নাকালী বলিল, "হবে যখন হয়।"

শ্লেষপূর্ণস্বরে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "ও, আজকাল তোরা একাহারী হয়েছিস্ বুঝি? ছেলেগুলোকেও এক-সন্ধ্যে খাইয়ে রাখিস্ নাকি?"

আন্নাকালী এ-প্রশ্নের কি জবাব দিবে? মুখের ভাবে পাছে ধরা পড়িয়া যায় সেইজন্য শুধু মাথার কাপড়টা আর-একটু টানিয়া দিল।

ঈষৎ তিরস্কারের সুরে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "আজকাল তোর ওইরকমই হয়েছে ছোটবৌ। রাধু সেদিন দুপুরবেলা গিয়ে বল্‌লে, তত বেলাতেও তার খাওয়া হয় নি। নাঃ, শুধু নিজেরা নয়, ছেলেপুলেদেরও মারতে বসেছিস্ দেখছি।... রাধু গেল কোথায়?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে..."

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? ইস্কুলে যায় না?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "না।"

শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, ইস্কুলের মাইনে জোটে না বুঝি?"

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে প্রিয়নাথ বলিলেন, "খেতেই পয়সা জোটে না আবার ইস্কুলের মাইনে!"

গম্ভীর ভাবে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "বলতে তোমার লজ্জা হলো না? এতে বুঝি ভদ্রলোকের মান বাড়ে?"

বিকৃতমুখে প্রিয়নাথ বলিলেন, "না খেতে পেয়ে অপরের দ্বারস্থ হওয়ার চেয়ে অন্ততঃ মান বজায় থাকে।"

ঈষৎ তীব্রকণ্ঠে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "আরো বেশী অপমান হতো যদি আমার দ্বারস্থ হতে, না?"

প্রিয়নাথ গম্ভীর ভাবে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নীল আকাশটা সূর্য্যকিরণে তখন পুড়িয়া যাইতেছে··· এক টুক্‌রা সাদা মেঘ কোথা হইতে সেই রৌদ্রদগ্ধ আকাশের নীচে আসিয়া পড়িল। মহাশূন্যে চলমান সেই স্বচ্ছ মেঘখণ্ডের দিকে চাহিয়া প্রিয়নাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

শ্যামাসুন্দরী ডাকিলেন, "ঠাকুরপো!"

চকিতের জন্য প্রিয়নাথ ফিরিয়া চাহিলেন।

শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার উদ্দেশ্য কি ঠাকুরপো?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "আমি নিজেই জানি না।"

—"কিন্তু আমি জানি।"

—"কী জানো?"

—"আমাকে জব্দ কর্‌বার উদ্দেশ্যই তোমার ষোলো আনা।"

—"তোমাকে জব্দ ক'রে আমার লাভ ?"

—"অনেক সময় মানুষ লাভ-লোকসান খতিয়ে কাজ করে না—নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করে।"

ঈষৎ হাসিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "তাতে যে নাক কাটে তারই ক্ষতি হয় বেশী।"

কথায় জোর দিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "কিন্তু যার যাত্রাভঙ্গ হয় তারও কম ক্ষতি হয় না !"

প্রিয়নাথ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কিন্তু আমার নাক কাটায় তোমার যে কি ক্ষতি হয়েছে তা তো বুঝতে পারছি না !"

কঠোরদৃষ্টিতে দেবরের মুখের দিকে চাহিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "বুঝতে পারছো না ?"

প্রিয়নাথ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না।"

শ্যামাসুন্দরী বসিয়াছিলেন, সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রিয়নাথের দিকে চাহিয়া অভিমানরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "এখন আর তা পারবে কেন ঠাকুরপো ! কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন তোমার পায়ে একটা কাঁটা ফুটলে বুঝতে পারতে, বৌঠানের বুকে কি বেদনা বাজতো ! তবে তখন বৌঠান্ ছিল আপন, এখন হয়েছে পর।"

প্রিয়নাথ মাথা তুলিয়া বেশ শান্তকণ্ঠেই বলিলেন, "যা বলেছো বৌঠান, পর না হ'লে আর আপনার লোককে কেউ লক্ষ্মীছাড়া ক'রে বাড়ী থেকে তাড়াতে পারে না।"

এত-বড় কঠিন উত্তরটা যে প্রিয়নাথ মুখের উপর দিতে

পারিবে তা শ্যামাসুন্দরী মনে করেন নাই। উত্তর শুনিয়া তিনি যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন এবং প্রত্যুত্তরে বলিবার মতন কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া রুদ্ধরোষে শুধু ফুলিতে লাগিলেন।

রাগে ফুলিতে-ফুলিতে খানিক পরে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তুমি কি মনে করো ঠাকুরপো, আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছি ?"

মৃদুহাসিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "না। তবে তুমি যেজন্যে এসেছো বৌঠান, তা আমি জানি।"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "কি জানো তুমি—শুনি ?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "ডিক্রীর টাকাগুলো রেহাই দিয়ে বাড়ীখানা যে আমায় ছেড়ে দিতে পারো তাই জানাতে এসেছো।"

গম্ভীরমুখে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তুমি ভুল বুঝেছো। টাকা বা বাড়ী কিছুই আমি ছাড়তে পারি না; সম্পত্তির মালিক এখন নলিন।"

বলিয়া সদর্প পদক্ষেপে বাহিরে আসিয়া পাল্কীতে উঠিলেন।

*

*   *

—"এই কথা ?"

—"হ্যাঁ এই কথা।"

—"কাঁদবি না ?"

জোরে ঘাড় দোলাইয়া সতী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "না, কক্‌খনো না।"

সতীর মুখের উপর কঠোরদৃষ্টিতে চাহিয়া রাধু বলিল, "কক্‌খনো না!—এঃ, কি বাহাদুর মেয়ে রে!"

মুখে একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য আনিয়া তীব্রকণ্ঠে সতী বলিল, "না, মেয়েরা কি আর বাহাদুর হতে পারে? যত বাহাদুর তোমরা বেটাছেলেরা। তোমরা সব পুষ্পরথে চড়ে এসেছো, আর বানের জলে ভেসে এসেছে এই মেয়েগুলো!"

রাগে মুখ কালো করিয়া রাধু বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, বানের জলে ভেসেই তো এসেছিস। একরত্তি মেয়ে তুই, এত জ্যাঠামী শিখলি কোত্থেকে বল্ তো ?"

মুখখানা উঁচু করিয়া সতী বলিল, "তোমার কাছ থেকে। ঈস্, আমি একরত্তি মেয়ে, আর উনি থুড়থুড়ে বুড়ো!"

বলিয়া রাধুর মুখের কাছে হাত নাড়িতেই রাধু সহসা ওর হাতটা ধরিয়া চুলের গোছায় এমন একটা অবাঞ্ছিত টান দিল যে, যন্ত্রণায় সতী অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল।

সে চীৎকারে সঙ্কুচিত রাধু সতীর হাত ছাড়িয়া দিয়া—মুখে খুব জোর দেখাইয়া বলিল, "কেমন, আর কখনো আমার মুখের ওপর চোপা করবি ?"

ঠোঁট ফুলাইয়া রোষকম্পিতকণ্ঠে সতী বলিল, 'না—করবে না ! বেশ করবো চোপা করবো । ভারি বাহাদুর ছেলে কিনা ; ওকে ভয় করবে !"

গর্জ্জন করিয়া রাধু বলিল, "বাহাদুর না তো কি ?"

চোখ-মুখ ঘুরাইয়া সতী বলিল, "বাহাদুর আছো নিজের ঘরে আছো, আমাকে কেন মারবে বলো তো ?"

অভিমানের আবেগে মেয়েটির কণ্ঠ গাঢ় আর চোখে জল আসিয়া পড়িল। সতীর সেই অভিমানক্ষুব্ধ সজলদৃষ্টির দিকে চাহিয়া রাধু এবার লজ্জিত হইয়া পড়িল, কিন্তু বাহিরে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিল না। শুধু স্বরে অপেক্ষাকৃত কোমলতা আনিয়া ধীরে-ধীরে বলিল, "সাধে কি আর তোকে মারি রে ? দিন-দিন তুই যে বেজায় দুষ্টু হয়ে উঠছিস্ !"

সজলকণ্ঠে সতী বলিল, "হ্যা, উঠছি দুষ্টু হয়ে—কি দুষ্টুমি করেছি আমি ? এখন তোমার সঙ্গে নাইতে গেলে মা আমায় মারবে না ?"

মুখ ভারী করিয়া রাধু বলিল, "ওঃ, মারবে ! ভারী ভয় ! মায়ের কাছে তো দিনরাত মার খাচ্চিস্ ।"

—"তাই ব'লে বুঝি মায়ের কথার অবাধ্য হবো ?"

—"কে বলছে তোকে অবাধ্য হতে ? মা কি আমার সঙ্গে নাইতে যেতে তোকে বারণ করেছে ?"

—"শুধু তোমার সঙ্গে কেন, সব ছেলের সঙ্গেই নাইতে যেতে খেলা করতে বারণ করেছে।"

—"নলিনদার সঙ্গেও ?"

বলিয়া রাধু ওর মুখের উপর যে কুটিলদৃষ্টিতে চাহিল, বালিকা হইলেও তা বুঝিতে সতীর বিলম্ব হইল না তাই ভ্রূভঙ্গী করিয়া গম্ভীরমুখে বলিল, 'ঈস্. খেলেছি বৈকি। কবে তার সঙ্গে খেলা করেছি বলো তো ? সেদিন যখন আমি নিজের মনে খেলছিলাম, সে তো নিজেই সেধে এসে কাছে বসলো।"

এবার কুটিলহাসি হাসিয়া রাধু বলিল, "আর তুমি অমনি তাকে কাদার পায়েস রেঁধে খাওয়ালে।"

ভীষণ রাগের ভঙ্গিতে সতী বলিল, "এ-এ-এঃ, খাইয়েছি ! তুমি দেখেছো ?"

ওর রাগ দেখিয়া রাধু খুব খুশী হইল ; সহাস্যমুখে বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছিই তো। না দেখলে আর বলছি ? সেই যে সেই কচুপাতায় ক'রে—"

জোরে ঘাড় নাড়িয়া সতী বলিল, "তুমি ছাই দেখেছো। পাতায় বুঝি পায়েস খাওয়া যায় ? আমি তো একটা নারকোল-মালায় দিয়েছিলুম···কচুপাতা তো আসন হয়েছিল। মিথ্যুক কোথাকার !"

রাধু বলিল, "ও, ঠিক ঠিক। কচুপাতাটা আসনই হয়েছিল

বটে। সত্যিই তাহ'লে আমার মিথ্যে কথা বলা হয়েছে। মোদ্দা, পায়েস রেঁধে তুমি খাইয়েছিলে এটা তো সত্যি ?"

ভারীমুখে সতী বলিল, "সেটা বুঝি আমার দোষ? সে কাছে ব'সে হ্যাংলার মতন দশবার জিগ্যেস করলে, 'কি রাঁধছো সতী, আমায় একটু খেতে দেবে না ?' তখন কি আর করি, ঢোলাশাকের চচ্চড়ি দিয়ে তো আর ভাত দিতে পারি না ; তাই তাড়াতাড়ি একটু পায়েস রেঁধে—"

তাহার বক্তব্যটুকু শেষ করিয়া দিবার জন্য রাধু বলিল, "বড়লোকের খাতির করলে। আমরা গরীবলোক কি না, তাই আমাদের ঢোলাশাকের চচ্চড়ি খাওয়াতে পারো।"

ঠিক পাকা গৃহিণীর মতন মাথা নাড়িতে-নাড়িতে সতী বলিল, "তা, ঘরের লোকের কথা আলাদা। তাই ব'লে বাইরের লোককে কি তা দিলে চলে ?"

রাধু বলিল, "তা তো বটেই। বাইরের লোকের পাতে লুচী-মোণ্ডা দিতে হয়।"

ঠোঁট ফুলাইয়া সতী বলিল, "হ্যাঁ, লুচী-মোণ্ডা না আরো-কিছু।...আচ্ছা, তুমি এত হিংসুটে কেন বলো তো ? মানুষ দেখলে তোমার গা জ্বালা করে—না ?"

মেয়েটির তিরস্কারে ক্ষুব্ধ হইয়া অভিমানপূর্ণকণ্ঠে রাধু বলিল, "বেশ, হিংসুটে আছি আমি আছি ; আমার সঙ্গে আর কথা কোয়ো না ; আর কথাই-বা কইবে কার সঙ্গে, আমরা তো এবার চলে যাচ্ছি।"

কি যেন একটু ভাবিয়া লইয়া সতী বলিল, "তবে আর কি, তোমরা চলে যাচ্ছো সেই ভাবনায় আমার ঘুম ধরছে না!"

রাধু বলিল, "গরীবের ভাবনায় কি আর বড়লোকের ঘুমের ব্যাঘাত হয়, তোদের গায়ে যে বড়লোকের হাওয়া লেগেছে!"

বলিয়া রাধু মুখ টিপিয়া হাসিতেই সেই হাসিটুকুকে বিদ্রূপের হাসি মনে করিয়া সতী আরও একটু রাগিয়া চড়া-গলায় বলিল, "বড়লোকের হাওয়া গায়ে লাগবে না তো কি গরীবলোকের পেছনে ঘুরে বেড়াতে হবে নাকি?"

—"না না, বড়লোকের পেছনে-পেছনে মন যুগিয়ে বেড়াও—যদি সে দয়া ক'রে তোমায় বিয়ে করে।"

—"দয়া ক'রে নয় গো, দয়া ক'রে নয়। সে আদর করেই বিয়ে করবে..."

সতীর কথার শেষে কার পায়ের শব্দ পাইয়া পিছন ফিরিতেই নলিনকে দেখিয়া রাধু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

—"মা বোধহয় ডাকছে" বলিয়া সতী ততক্ষণে বাড়ীর দিকে ছুটিয়াছে...

রাধুর দিকে চাহিয়া শ্লেষতীব্রকণ্ঠে নলিন বলিল, "তোমার ইচ্ছে বুঝি রাধুবাবু, তোমার সঙ্গেই সতীর বিয়ে হয়?"

এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে রাধু ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া হাতের ছড়িটা মাটিতে ঠুকিতে-ঠুকিতে নলিন বলিল, "সেটি কিন্তু হচ্ছে না রাধু, বুঝলি? মামাবাবু বলেছেন, আমার সঙ্গেই সতীর বিয়ে হবে আর ওর বাপেরও তাই মত।"

রাধু বলিল, "তাহ'লে তো ভালোই হয় দাদাবাবু।"

মুখখানাকে একরকম কুঞ্চিত করিয়া নলিন বলিল, "ভালোই হয় তো সেই কথাটা নিয়ে এতক্ষণ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলি কেন রে হতভাগা? আমি বড়লোক···সতী আমার মন যোগাবে··· খোসামোদ করবে···আমি সব শুনতে পেয়েছি।"

ভীতিজড়িতকণ্ঠে রাধু বলিল, "কৈ, না তো—"

—"না তো! রাধুর কাঁধে ছড়ির একটু ঠেলা দিয়া ক্রুদ্ধস্বরে নলিন বলিল, "মিথ্যুক কোথাকার! একটু আগে সতীর মুখের কাছে হাত নেড়ে-নেড়ে কি বলছিলি তবে?"

দারুণ লজ্জায় চারিদিকে চাহিতে-চাহিতে রাধু দেখিল, দূরে সতীদের বাড়ীর দরজার উপর সতী দাঁড়াইয়া এ দৃশ্য দেখিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

অধিকতর লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া রাধু মাথা নীচু করিতেই নলিন ওর শুষ্কমুখের দিকে চাহিয়া কঠোর আদেশের স্বরে বলিল, "এই তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি রাধু, আর তুমি কোনদিন এদিকে এসো না। ফের যদি আসতে দেখি তবে চাবুক মেরে তোমার পিঠের চামড়া তুলবো!"

বলিয়া সে ছড়িটা রাধুর নত-মুখের উপর উচাইয়া আবার নামাইয়া সতীদের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

রাধু ম্লানদৃষ্টিতে বাড়ীখানার দিকে একবার চাহিয়াই ধীরে-ধীরে ভিন্ন পথ ধরিল।

*

*   *

সতীর বয়স যখন মাত্র চার বছর, তখন সেই ফুটফুটে মেয়েটিকে দেখিয়া রমানাথ, সতীর বাপ রমেশ চৌধুরীকে ব'লিয়াছিলেন, "রাধু বড় হ'লে আমি ওর সঙ্গে সতীর বিয়ে দেবো, রমেশদা।"

রমেশ চৌধুরী সে-কথা শুনিয়া যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইয়াছিলেন এবং বন্ধুত্বসূত্রে এই দুই পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা থাকিলেও সেইদিন হইতে সে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু কিশোর রাধানাথ আর বালিকা সতী সে ঘনিষ্ঠতার কারণ না বুঝিলেও—কি জানি কোন্ এক অজ্ঞাত আকর্ষণে পরস্পরের শৈশবসখিত্ব ক্রমে অধিকতর প্রগাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। খেলা-ধূলায় হাসি-কান্নায় উভয়ে উভয়ের মনকে একেবারে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রকৃতির লীলাচক্রের আবর্ত্তনে মানুষের মনেরও অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ঘটে। সে পরিবর্ত্তনে শত্রু মিত্র হয়, মিত্র শত্রু হয়। কালে রমানাথ মল্লিক ও রমেশ চৌধুরীর মধ্যেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। তুচ্ছ একটা সামাজিক ব্যাপার লইয়া উভয়ের মধ্যে যে মনোমালিন্যের সূচনা হইল, সেই মনোমালিন্য ক্রমে ঘোরতর বিবাদের আকার ধারণ করিয়া শেষে মামলা-মোকদ্দমায় পরিণত হইল এবং ইহার ফলে রমেশ চৌধুরী

সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন—রমানাথ তাঁর জমি-জায়গা বাগান-পুষ্করিণী সব অধিকার করিয়া বসিলেন। তখন হইতে উভয় পরিবারে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হইয়া গেল।

রাধু ও সতীর মধ্যে কিন্তু মুখ-দেখাদেখি বন্ধ হইল না। সাংসারিক বিবাদ-বিসংবাদের তরঙ্গ সংসারবোধহীন এই দুটি বালক-বালিকার অকলুষ চিত্তকে স্পর্শ করিয়া পঙ্কিল করিতে বা সেখানে বিচ্ছেদের রেখা টানিয়া দিতে পারিল না। বরং তাদের শৈশবপ্রীতিতে এক অজানা-স্নেহসুধারসে সিঞ্চিত পীযূষ-বীজের অঙ্কুর ধীরে-ধীরে দেখা দিতে লাগিল। সদ্য উন্মেষিত এই বীজাঙ্কুর সৃষ্টির কাহিনী আর কেউ না জানিলেও রমানাথ জানিলেন, সংসারের কঠোর কুটিলতার মধ্যে সুকোমল শিশুমনের এই পবিত্র প্রীতির সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইলেন। তারপর কিছুকাল গত হইলে, মহাকালের আহ্বানে একদিন অন্তিমশয্যায় শুইয়া তাঁর স্ত্রী ও ভাইকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন, "আমি রমেশ চৌধুরীকে কথা দিয়েছি, রাধুর সঙ্গে সতীর বিয়ে দেবো। আমার সে কথাটা যেন কেউ ভুলে যেও না।"

কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরই চৈত্রবায়ুবিতাড়িত তুলারাশির মত একটা আকস্মিক গৃহবিচ্ছেদের ঝড় আসিয়া সংসারটাকে যখন ওলটপালট করিয়া দিল তখন শ্যামাসুন্দরীকে অগত্যা স্বামীর আদেশ ভুলিয়া থাকিতে হইল। তারপর কালের অমোঘ নিয়মে এই সময়ের মধ্যে রমেশ চৌধুরীর সঙ্গে বিবাদের স্মৃতি

অনেকটা মুছিয়া আসিল এবং রমেশকে বড়-তরফে মুহুরির পদে নিযুক্ত করিয়া বৈদ্যনাথ সে স্মৃতিটাকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দিবার পর আবার উভয়পরিবারে একটু-একটু করিয়া ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রিয়নাথ তখন সে ঘনিষ্ঠতা হইতে অনেক দূরে। কাজেই শ্যামাসুন্দরী চুপ করিয়া রহিলেন।

সেইদিন কিন্তু তাঁকে এই নিশ্চেষ্টতা ত্যাগ করিতে হইল যেদিন বৈদ্যনাথ আসিয়া তাঁর কাছে প্রস্তাব করিলেন, রমেশ চৌধুরীর মেয়ের সঙ্গে নলিনের বিবাহ দিলে ভালো হয়···মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনি সুশীলা। নলিনেরও এই মেয়েটিকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে।

মেয়েটি যে সুশীলা ও সুন্দরী তা জানিলেও শ্যামাসুন্দরী আপাততঃ এ-প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না, কিন্তু অনুসন্ধানে জানিলেন যে, নলিন ইদানীং রমেশ চৌধুরীর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করিয়াছে এবং প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছে। এই যাতায়াতে বা ঘনিষ্ঠতায় শ্যামাসুন্দরীর আপত্তি ছিল না, কিন্তু স্বামীর আদেশ মনে করিয়া তিনি চঞ্চল হইয়া পড়িলেন ও তাড়াতাড়ি নলিনের অন্যত্র বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চেষ্টার উদ্যোগপর্ব্বেই নলিন বাধা দিল; সে বেশ নির্ভীক ভাবেই স্পষ্ট জানাইয়া দিল যে, সতীর সঙ্গে বিবাহ না হইলে সে আর বিবাহই করিবে না!

পুত্রের এই বাচালতায় শ্যামাসুন্দরী শুধু বিরক্ত হইলেন না,

যথেষ্ট ক্রুদ্ধও হইলেন। কিন্তু তাঁর সে ক্রোধ বা বিরক্তি স্থায়ী হইল না; অপত্যস্নেহের প্রবল স্রোতে তাঁর সকল দৃঢ়তা যখন ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল তখন তিনি কি করিবেন ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। অনেক চিন্তার পর শেষে স্থির করিলেন…এ-বিষয়ে প্রিয়নাথের কাছে পরামর্শ লওয়া উচিত। তার এখন যেরূপ অবস্থা তাতে সে এ-সময়ে রাধুর বিবাহ দিতে পারিবে না, আর রমেশ চৌধুরীও যে বিবাহের উপযুক্ত মেয়েকে বেশীদিন রাখিতে পারিবে এমন মনে হয় না; দায়ে পড়িয়া তাকেও অন্যত্র চেষ্টা দেখিতে হইবে। এ-অবস্থায় প্রিয়নাথের মত লইয়া নলিনের সঙ্গে সতীর বিবাহ দিলে সব দিক বজায় থাকিবে আর তা হইলে স্বামীর অঙ্গীকার ও অনুরোধ প্রকারান্তরে পালন করাই হইবে। নিজের পুত্রবধূ আর ভাইয়েরা পুত্রবধূ ও একই কথা। সতী তো এই বংশেরই কুলবধূ হইবে…

এই মনে করিয়া শ্যামাসুন্দরী প্রিয়নাথের সঙ্গে দেখা করিবার সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু সঙ্কল্প সহসা কাজে পরিণত করিতে পারিলেন না। এতকাল পরে এইরূপ একটা স্বার্থগন্ধ-কলুষিত প্রসঙ্গ লইয়া প্রিয়নাথের কাছে যাইতে তাঁর চিত্তটা বেশ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ছি ছি, ঠাকুরপো কি মনে করিবে! তাঁকে নিতান্ত স্বার্থপর ভাবিয়া কি ঘৃণার হাসি হাসিবে না? আপনার স্বার্থপরতায় আপনি লজ্জিত হইয়া যাই-যাই করিয়াও শ্যামাসুন্দরী এতদিনের মধ্যে যাইতে পারিলেন না।

এমন সময়ে প্রিয়নাথ বাড়ী ছাড়িয়া কাল চলিয়া যাইবেন শুনিয়া, এই অছিলায় তিনি প্রিয়নাথের সঙ্গে আবার দেখা করিতে চলিলেন।

*

* *

তারপর কালের স্রোতে বিলীন কয়েকটি সাল গত হইবার পর একদিন প্রখর মধ্যাহ্নে ঘর্ম্মাক্ত দেহে বাড়ী ফিরিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "বাড়ী ঠিক ক'রে এলাম ছোটবৌ, কালই আমরা চলে যাবো এখান থেকে।"

—"কোথায় ঠিক ক'রে এলে গা ?"

বলিয়া স্বেদক্লিষ্ট শ্রান্ত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া আন্নাকালী বলিল, "থাক্ থাক্, পরে শুনবো। তুমি ব'সে একটু জিরোও আগে···ঘেমে একেবারে নেয়ে গেছ যে !"

ঘরের ভিতর হইতে একখানা হাতপাখা আনিয়া আন্নাকালী স্বামীকে বাতাস করিতে বসিল।

প্রিয়নাথ বসিয়া বলিলেন, "ঠিক ক'রে এলাম, পাঁচ ক্রোশ দূরে রাজহাটী গ্রামে। আমাদের জমিদারী-এলাকার বাইরে আমার বন্ধু মনোহরের জমিদারীর সীমানার মধ্যে। ছেলেবেলায় আমরা চাঁদগোপাল গুরুমশায়ের পাঠশালায় একসঙ্গে পড়তাম। অতদূর থেকে আসা-যাওয়া অসুবিধা ব'লে মনোহরের

বাবা আমাদের বাড়ীতে রেখে তার পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি আমার বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন···সেই সুবাদে মনো আমার মাকে কাকীমা ব'লে ডাকতো। কি সুখেই যে বাল্যকালটা কেটেছে আমাদের, মনে হ'লে আজও সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে যাই···”

বাতাস করিতে-করিতে আন্নাকালী বলিল, “বলি, হ্যাঁগা! তা, কাছাকাছি কোথাও বাড়ী পাওয়া গেল না, একেবারে পাঁচ-কোশ দূরে?”

একটা সজোর নিঃশ্বাস টানিয়া ধীরে-ধীরে সেটা ফেলিতে-ফেলিতে প্রিয়নাথ বলিলেন, “কাছাকাছি সবই তো নলিনের জমিদারী। বৌঠান সেদিন জোরগলায় ব'লে গেলেন, শুনলে না, যে, সমস্ত সম্পত্তির মালিক এখন নলিন···তাঁর কিছুতে হাত নেই? তুমি কি নলিনের শাসনের মধ্যে থাকতে বলো আমায়? না, সে আমি কিছুতেই পারবো না ছোটবৌ। রামের বাণ সহ্য করা যায়, কিন্তু হনূমানের দাঁত-খিঁচুনী অসহ্য!”

এত দুঃখেও এই উপমায় আন্নাকালীর হাসি আসিল।

তারপর বাড়ী ও বৌঠান সম্বন্ধে নানা আলোচনার পর প্রিয়নাথ একটু সুস্থ হইতেই আন্নাকালী পাখা রাখিয়া স্বামীকে স্নানের তেল ও গামছা আনিয়া দিল।

স্নানাহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইয়া প্রিয়নাথ যখন মোটঘাট বাঁধিবার উপক্রম করিতেছেন তখন পাশের ছায়ানিবিড়

আমগাছের মাথায় অস্ত-রবির বিদায়ের পালা স্থরু হইয়াছে। লালের মাদকতায় আকাশে-মানুষে কেমন একরকম উদাসীন আচ্ছন্ন ভাব!

একটা ছোট বোঁচকা বাঁধিতে-বাঁধিতে ভারাক্রান্ত মনে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "জন্মভূমির মায়ার বাঁধন আমার গ্রন্থি খুলে দিতে চাইছে না ছোটবৌ, তবু এ বাঁধন ছিঁড়ে আমায় যেতে হবে।"

স্বামীর মুখের ভাবে শঙ্কিত হইয়া আন্নাকালী বলিল, "একটা কথা বলবো, যেন রাগ কোরো না। আচ্ছা, দিদিকে আর-একবার ডাকিয়ে এ-বিষয়ে একটা পরামর্শ করলে ভালো হয় না?"

—"কোন্ বিষয়ে? তাঁর দয়ার দান নিয়ে যাতে নলিনের শাসনে তার অধিকারে থাকতে পাই? এত দুঃখেও তুমি হাসালে ছোটবৌ! বলো তো তাই করি না হয়। তাঁকে ডাকিয়ে বলি, আমার অপরাধ আমি বুঝতে পেরেছি, আমায় ক্ষমা ক'রে এখন নলিনের আশ্রয়ে একটু স্থান ক'রে দাও বৌঠান!"

স্বামী-স্ত্রীর তন্ময়তা ভঙ্গ করিয়া সত্যই বৌঠানের কণ্ঠস্বরে পিছন হইতে কে যেন এ-কথার উত্তর দিলেন, "কারও আশ্রয়ে না থেকে যদি তোমার নিজের জমিতে তুমি স্বাধীন ভাবে থাকতে পাও ঠাকুরপো, তাতেও কি তোমার অপমান হবে?"

প্রিয়নাথ চমকাইলেন না। বৌঠানের আগমন নিশ্চিন্ত বুঝিয়া পিছন ফিরিয়া বলিলেন, "তার মানে ?"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "মানে খুব সোজা। মানে হচ্ছে এই যে, এখনো আমি বেঁচে আছি। সম্পত্তি নলিনের হলেও—"

সেদিনের কথা স্মরণ করিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "তুমি হচ্ছো নলিনের মা।"

বলিয়া প্রিয়নাথ একটু হাসিলেন।

ক্ষুব্ধস্বরে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তুমি ভুল বুঝো না ঠাকুরপো, আমি বলতে চেয়েছিলাম, ছেলের উপর মায়ের যতটা অধিকার আছে, ছেলের বিষয়ের উপর ততটা নেই।"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "সে অধিকার-অনধিকার জানবার অধিকার আমার নেই বৌঠান। আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরের দরকার কি ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "জাহাজের খবরে দরকার না থাক্, ডিঙ্গী-নৌকোর খবরেও তো দরকার আছে।"

উদাসীনের মতন প্রিয়নাথ বলিলেন, "তাও নেই। মানুষের যখন সর্ব্বস্ব পুড়ে যায় তখন সেই পোড়া ছাই আগলে কেউ ব'সে থাকে না।"

ভ্রূকুটী করিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন,"তাই বুঝি তুমি সর্ব্বস্ব পুড়িয়ে শেষে এই ছাইএর আশ্রয়টুকু ছেড়ে গাছতলায় যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছো ?"

ম্লানমুখে খানিকটা প্রফুল্লতা আনিবার চেষ্টা করিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "তা হয়েছি। কারণ সেই গাছতলাই এখন আমার স্বর্গ।"

ক্রোধস্ফুরিতকণ্ঠে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তোমার এখন গাছতলায় স্বর্গ, উপোসে তৃপ্তি, কান্নায় সুখ এ সব তো হবেই। তুমি যে একজন মস্ত বীরপুরুষ তা আমি জানি।"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "তুমিই না সেদিন বলেছিলে বৌঠান, যে, তুমি কোনদিন আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসো না?"

ঈষৎ লজ্জিত ভাবে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "হ্যাঁ, বলেছি, আর আজও বলছি, যা বলেছি তা মিথ্যে নয়। কেন আমি এসেছি জানো?"

—"কেন?"

—"রমেশ চৌধুরীর মেয়ে সতীর সঙ্গে রাধুর বিয়ের কথাবার্ত্তা হয়েছিল মনে আছে তোমার?"

একটু ভাবিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "পাকা কথাবার্ত্তা এমন কিছু হয় নি ; তবে দাদা একদিন রহস্য ক'রে রমেশবাবুকে কথাটা বলেছিলেন বটে।"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "রহস্য ক'রে নয়, তিনি যা বলেছিলেন, সত্যিই বলেছিলেন। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি দেখে বৌ ক'রে তাকে ঘরে আনতে তাঁর ইচ্ছে হয়, কিন্তু খুব ছোট মেয়ে ব'লে নলিনের সঙ্গে বিয়ের কথা বলতে পারেন নি তাই রাধুর কথা বলেছিলেন।"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "তাই সম্ভব।"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "সম্ভব-অসম্ভবের কথা নয় ঠাকুরপো, তিনি যা বলেছিলেন তা আমাদের কাছে বেদবাক্যের মতন। রমেশ চৌধুরীও মনে-মনে তাই ঠিক দিয়ে রেখেছে। কিন্তু—"

মলিন হাসিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "কিন্তু রাধুর বাপের অবস্থা দেখে তিনি এখন পিছিয়ে যাচ্ছেন—এই না ?"

শ্যামাসুন্দরী তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "দুঃখে-কষ্টে পড়লে মানুষের মন এমনি ছোট হয়ে যায় বটে, তাই ব'লে নিজের ছোট মন দিয়ে অন্যের বড় মন মেপে দেখা উচিত নয়। তোমার দাদা কি এমন লোক ছিলেন যে, এইরকম একটা নীচ লোককে বন্ধু ব'লে স্বীকার করেছিলেন ?"

অপ্রতিভ ভাবে প্রিয়নাথ বলিলেন "সত্যি বৌঠান, অবস্থার ফেরে প'ড়ে মনটা আমার সত্যিই ক্রমে ছোট হয়ে যাচ্ছে।"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "সেইরকমই তো দেখছি। অবস্থার ফেরে পড়লে মানুষের মন এইরকমই বদলে যায় বটে। যাক্, মেয়েটি এবার এগারো বছরে পড়েছে।"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "এগারো ছেড়ে একুশে পড়লেও এখন রাধুর সঙ্গে তার বিবাহের কোন সম্ভাবনা নেই। ছোটবৌ আমার সঙ্গে গাছতলায় যেতে পারে, কিন্তু ছেলের বৌকে নিয়ে আমি সেখানে দাঁড়াতে পারি না।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে বিষাদের নিবিড় ছায়া আসিয়া প্রিয়নাথের সারা মুখ একেবারে কালো করিয়া দিল।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তাহ'লে এখন মেয়েটার উপায় ?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "নিরুপায় হবার মতন তো কিছুই দেখছি না। কথার যখন কিছু পাকাপাকি হয় নি তখন তিনি স্বচ্ছন্দে অন্যত্র চেষ্টা দেখতে পারেন।"

শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাতে তোমার আপত্তি নেই ?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "এতে আর আপত্তির কি থাকতে পারে !"

গম্ভীর ভাবে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "বেশ।"

একটু থামিয়া প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু, রমেশ চৌধুরীর মেয়ের জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কেন বৌঠান, যে, এই জানতে আজ এতদিন পরে তুমি পাল্কী ক'রে এখানে ছুটে এসেছো ?"

ধীর গম্ভীরস্বরে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "মাথাব্যথা একটু না থাকলে সত্যিই আমি এতকাল পরে ছুটে আসতাম না ঠাকুরপো। তুমি যদি ছেড়ে দাও তো অগত্যা আমি নলিনের সঙ্গে সতীর বিয়ে দেবো।"

—"ও" বলিয়া প্রিয়নাথ মৃদু হাসিলেন।

—শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "নলিনেরও ইচ্ছে, সতীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়।"

একটু ভাবিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "বেশ, তাই হোক্।"

শ্যামাসুন্দরী আর কিছু না বলিয়া ধীরে-ধীরে বাহিরে আসিয়া পাল্কীতে উঠিলেন।

*

*　　*

—"মাসীমা কোথায় গো ?"

বলিতে-বলিতে দরজা ঠেলিয়া উঠানে আসিয়া নলিন দেখিল মাসীমা বাড়ীতে নাই, দাওয়ার এক কোণে বসিয়া সতী ফুল বাছিয়া সাজিতে সাজাইতেছে।

'যাদৃশী ভাবনা যস্য'—ভালোই হইয়াছে। নলিন স্বরটাকে যতখানি সম্ভব মিষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মাসীমা কোথায় সতী ?"

ভ্রূ নাচাইয়া, 'জানি না' বলিয়া সতী মুখ ফিরাইয়া লইল।

ওর এই বিরক্তিটুকু নলিন যে বুঝিতে পারিল না তা নয় ; কিন্তু ইহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কাপড় কাচতে গিয়েছে বোধ হয় ?"

সতী 'হাঁ, না' কিছুই বলিল না।

নাই বলুক, নলিন ততক্ষণে সতীকে দেখিলেই ওর যে গানটা মনে পড়ে গুনগুন করিয়া সেই গানটা ধরিয়াছে :

"ভালো বাসিবে ব'লে ভালো বাসিনে ;
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।"

গানের সঙ্গে-সঙ্গে হাতের ছড়িটা তালে-তালে মাটিতে ঠুকিতে-ঠুকিতে হঠাৎ মুখ তুলিয়া সতীর দিকে প্রীতির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "চুপ ক'রে কাঠের পুতুলের মতন ব'সে রইলে যে, একটা আসন-টাসন দাও ?"

দাওয়ার এদিকে-সেদিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাহিয়া সতী বলিল "আসন এখানে নেই।"

চোখের ভঙ্গিটা সময়োচিত করিয়া নলিন বলিল, "এখানে না থাকলেও, ঘরে আছে নিশ্চয়। একটু কষ্ট স্বীকার ক'রে না হয় ঘরেই গেলে একবার আমার জন্যে!"

সতীর কিন্তু আসন দিবার জন্য ঘরে যাইবার কোন চেষ্টা দেখা গেল না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নলিন শেষে নিরাসনেই দাওয়ার পাশে পা ঝুলাইয়া বসিয়া পড়িল এবং পা দুলাইয়া দাওয়ার গায়ে জুতার গোড়ালি ঠুকিতে-ঠুকিতে আমতা-আমতা করিয়া বলিল, "আচ্ছা, সতী!"

সতী সে আহ্বানের কোন উত্তর দিল না।

না দিলেও নলিন হতাশ বা বিরক্ত হইল না; বরং গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিল, "আমাকে দেখলে তোমার বড্ড লজ্জা হয়—না?"

সতী এ-কথায় সাড়া না দিলেও ওর মুখের উপর যে একটা লজ্জার রক্তিম রাগ ফুটিয়া উঠিল সেটাকে কিছুতেই গোপন করিতে পারিল না।

নলিন সতৃষ্ণদৃষ্টিতে সতীর সেই লজ্জা-রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া হাস্যপ্রফুল্ল স্বরে বলিল, "তা হোক্, মেয়েমানুষের লজ্জা আমি খুব পছন্দ করি। লজ্জাবতী মেয়ের আরও রূপ খোলে যখন সে মুখ নীচু ক'রে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে। তাই ব'লে বোবা মেয়ে…"

বাকি কথাটা ও আর শেষ করিল না।

সতীর লজ্জারক্ত মুখটা এবার একটু গম্ভীর হইয়া আসিল। সেই গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া নলিন বলিল, "চুপ ক'রে থেকো না, কিছু বলো! এখানে যখন কেউ নেই তখন আমার সঙ্গে কথা কইতে আর দোষ কি?"

এ-কথার উত্তরে যা বলা উচিত সতী তা বলিল না; বলিল, "তোমার সঙ্গে কথা কইতে যাবো কেন?"

একটু হাসিয়া, চোখটা একটু টিপিয়া নলিন বলিল, "কেন তা কি জানো না?"

—"না" বলিয়া সতী অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

নলিন বলিল, "না জেনে থাকো, শীগগির জানবে। কিন্তু তোমাকে একটা কথা ব'লে রাখি, ঐ রেধো ছোঁড়ার সঙ্গে একদম্ কথাবার্ত্তা ক'য়ো না।"

মুখ ঘুরাইয়া সতী বলিল, "কেন কথা কইবো না?"

নলিন বলিল, "কইবে না—মানে, ও ছোঁড়া ভারী অসভ্য।"

—"তোমার চেয়ে?"

—"আমায় বলছো?"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমায় বলছি। তুমি মিনি দোষে তাকে গাল দিয়ে সেদিন মারতে গিয়েছিলে কেন?"

নলিন যেন একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিল, "ও, আমি—আমি ওকে মারতে গিয়েছিলাম কেন জানো? ও ছোঁড়া

সেদিন চুপি-চুপি আমার বৈঠকখানায় ঢুকে আমার সোনার বোতাম সেট্‌টা চুরি কচ্ছিলো।"

রাগে কাঁপিতে-কাঁপিতে সতী বলিল, "তুমি শুধু অসভ্য নও—মিথ্যুক।"

সতীর এ-কথায় কোনরকমে রাগ সামলাইয়া লইয়া হাসির ভান করিয়া নলিন বলিল, "আমি মিথ্যুক এমন কথা আমার মুখের সামনে কেউ বলতে পারে না। বল্‌লে—"

বাকি কথাটা শেষ করিবার অবসর না দিয়াই সতী বলিয়া উঠিল, "বল্‌লে—তুমি বড়লোক, দু'চার ঘা চাবুক বসিয়ে দিতে···বাহাদুরী তো এই পর্য্যন্ত!"

সতীর এই শ্লেষোক্তিতে নলিন যেন একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল; নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য বলিল, "না না, তা নয়, তোমার কাছে বাহাদুরী জানাতে চাই না···তবে আমি বলি কি, রেধো ছোঁড়াকে তুমি চেনো না। ও ছোঁড়া হচ্ছে ভয়ানক বদমাস্!"

ভ্রূকুটি করিয়া সতী বলিল, "সে বদমাইস হোক্, সাধু হোক্ তাতে আমার কি, আর তোমারই-বা কি?"

এ-কথার উত্তর দিতে না পারিয়া নলিন পকেট হইতে সিগারেট ও দেশালাই বাহির করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ফস্‌ফস্ করিয়া টানিতে লাগিল এবং সেই টানের সঙ্গে খুব জোরে-জোরে কাসিয়া এটা যে ওর সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত বিদ্যা,—

শুধু বড়মানুষী চাল দেখাইবার জন্যই সময়ে-সময়ে খাইয়া থাকে তার প্রমাণ দিতে লাগিল।

এমন সময় গৃহকর্ত্রী কাঁকালে জলভরা কলসী লইয়া ক্রন্দনরত শিশুপুত্রের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া তীব্র ভাষায় তাকে তিরস্কার করিতে-করিতে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং দাওয়ায় উপবিষ্ট নলিনকে দেখিয়া হর্ষোচ্ছ্বাসপূর্ণ মুখে একবার ওর দিকে চাহিয়াই ছেলের হাত ছাড়িয়া দিয়া তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা কপাল পর্য্যন্ত টানিয়া দিলেন। তারপর ব্যস্ত ভাবে দাওয়ার উপর কলসীটা রাখিয়া হাসিতে-হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন্ এলে বাবা ?"

সিগারেটে একটা জোর টান দিয়া কাসিতে-কাসিতে নলিন অস্পষ্টস্বরে উত্তর দিল, "এই একটু আগে এসেছি মাসীমা।"

মাসীমা কাঁধের ভিজা কাপড়গুলা নামাইয়া—তার এই আসায় যে তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন এবং তাঁদের উপর যে নলিনের দয়া অপরিসীম, হর্ষগদ্গদকণ্ঠে ইহাই ব্যক্ত করিতে-করিতে হঠাৎ যখন দেখিলেন, এত-বড় সম্মানিত অতিথি মাটির উপর নিরাসনে বসিয়া আছে তখন নিতান্ত লজ্জিত ও সন্ত্রস্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "মাগো, তুমি শুধু মাটিতে ব'সে আছো ?"

তারপর তিনি কন্যার দিকে তিরস্কার-কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ লা সতী, সঙের মত ব'সে আছিস্, একখানা আসন পর্য্যন্ত দিতে পারিস নি ?"

সতী কোন উত্তর না দিয়া তেমনি বসিয়াই রহিল। গৃহিণী তখন বুদ্ধি করিয়া বুদ্ধিবিবেচনাশূন্য হতভাগা মেয়েটাকে তীব্র-ভাষায় তিরস্কার করিয়া নলিনবাবুর অনাদরের শোধ লইতে উদ্যত হইলেন। নলিন কিন্তু তাঁকে সে অবসর না দিয়া পাকা বুদ্ধিমানের মতন নিজের অনাদরটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "তা হোক্ মাসীমা, এ তো ঘরের কথা। তোমাদের ঘর আর আমার ঘর কি আলাদা?"

নলিনের এই উদার উত্তরে আপ্যায়িত হইয়া গৃহিণী ওর গরীবের উপর দয়া ও সমদর্শিতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে-করিতে সতীকে শাসন করিবার ভঙ্গিতে জানাইলেন যে, এরূপ উদার ও সদয় অতিথির সাদর অভ্যর্থনা না করিয়া সে কতদূর অন্যায় কাজ করিয়াছে। সতী তা বুঝিল কি না সেই জানে, সহসা দাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

নলিন সতৃষ্ণদৃষ্টিতে প্রস্থিতা সতীর দিকে চাহিয়া-চাহিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "ছেলে-মানুষ!"

গৃহিণী কিন্তু কন্যার প্রতি নলিনের এই সহানুভূতিতে সায় না দিয়া বেশ একটু তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "ছেলেমানুষ আব কোথায় বাবা, ষেটের কোলে এগারোয় পা দিয়েছে, তাছাড়া গড়নটাও তো দেখছো, কম বাড়ন্ত নয়; আজ-বাদে কাল পরের ঘর করতে হবে, সেখানে তো এরকম ছেলেমানুষি ক'রে রেয়াত পাবে না; তখন যে আমাকেই পাঁচ কথা শুনতে হবে।"

গণকঠাকুরের মতন নলিন ভবিষ্যৎ বলিয়া দিল,"না মাসীমা, ওর জন্যে আপনাকে কিছু শুনতে হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ছেলেমানুষ হলেও ও খুব চালাক-চতুর আছে।"

নলিনের মুখে মেয়ের প্রশংসা শুনিয়া হাসিতে-হাসিতে মাসীমা বলিলেন, "তা আছে বাবা, নেহাত যে হাবা-বোবা, তা নয়। তবে কি জানো, একটু আব্দারে। মরা-হাজা কি না; তার ওপর উনি বরাবর আদর দিয়ে এসেছেন তাই যা গোঁ ধরে, কিছুতেই ছাড়ে না। তা নইলে মেয়ে আমার আর সবদিকে খুব ভালো।"

নলিন নীরবে বসিয়া পা দুলাইতে লাগিল। সতীর মা এবার মুখে একটু গাম্ভীর্য্য আনিয়া বলিলেন, "তা ভালোই হোক্ আর মন্দই হোক্ বাবা, এখন পার করতে পারলে বাঁচি। আমার তো দিন-রাত শুধু ঐ ভাবনা। তা উনি বলেন, ভাবনা কি, মেয়ে তো আর কুশ্রী-কুরূপ নয় যে কেউ পছন্দ করবে না; রূপে-গুণে মা যেন একেবারে লক্ষীঠাকরুণ। তা আমি বলি, ওগো, আজকাল কি আর রূপগুণের আদর আছে; আদর এখন শুধু টাকার। কথায় বলে, টাকার জোর থাকলে, কুঠে-পাঁঠাও বিকিয়ে যায়!"

দাওয়ার গায়ে জোরে পা ঠুকিয়া নলিন বলিল, "ড্যাম্ টাকা! যারা ছোটলোক, এক পয়সার ভিখিরী, তারাই শুধু টাকা চায়। নইলে আগে রূপ-গুণ, তার পর টাকা। আমি এই ব'লে রাখছি মাসীমা, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো, খুব

বড়লোকের ঘরে ওর বিয়ে দিয়ে দেবো। সে ভার আমার।"

আশার আশায় খুব খুশী হইয়া মাসীমা বলিলেন, "তা তো বটেই বাবা, তুমি যখন সহায় আছো তখন আমাদের আবার ভাবনা কি? তুমি রাজা হও...দীর্ঘজীবী হও...তুমি মনে করলে কি না করতে পারো!"

গর্ব্বপ্রফুল্লমুখে নলিন বলিল, "পারি সব মাসীমা, তবে—"

বক্তব্যটা শেষ না করিয়াই নলিন সিগারেটে একটা জোর টান দিল। কিন্তু অত জোর-টানেও ধোঁয়া বাহির হইল না দেখিয়া, খানিক কাসিয়া পকেট হইতে দেশালাই বাহির করিয়া ধরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মাসীমা বলিলেন, "উঠলে যে বাবা? একটা পান-টান— বলি, সতী, ওলো সতী! আ-মরণ, কোন্ চুলোয় গেল দেখ। তুটো পান সেজে এনে দে না লো!"

সতীর তরফ হইতে এ-আহ্বানের সাড়া আসিল না।

নলিন ব্যস্ত ভাবে বলিল, "থাক্ থাক্, আর পান চাই না।"

বলিয়া সিগারেটে টান দিতে-দিতে দাওয়া হইতে নামিয়া উঠান পার হইবে এমন সময় রমেশবাবু বাড়ীতে ঢুকিয়াই সিগারেটপানরত নলিনের দিকে বক্র-কটাক্ষে চাহিলেন।

নলিন যেন একটু অপ্রতিভ হইয়াছে এই ভাবে মুখের জ্বলন্ত সিগারেটটা হাতের তেলোয় লুকাইয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িতে-ছাড়িতে ছড়ি হাতে বাহির হইয়া গেল।

রমেশবাবু কঠোরদৃষ্টিতে ওর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

স্বামীকে ঐ অবস্থায় থমকিয়া থামিতে দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ গা, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে?"

গৃহিণীর আহ্বানে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতে রমেশবাবু গম্ভীর ভাবে গিয়া দাওয়ায় উঠিলেন এবং কাঁধের চাদরটা মাটিতে ফেলিয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

*

* *

—"বড়বৌ!"

—"কি গো, অমন ক'রে ব'সে পড়লে যে!"

—"নলিনবাবু কি আজকাল রোজই বেড়াতে আসে?"

—"রোজ আসবে কেন? তবে মাঝে-মাঝে আসে বটে।"

—"কেন আসে তা জান কি?"

—"জানবো আবার কি। বড়লোক—খুশী হয় তাই অবরে-সবরে বেড়াতে আসে।"

গম্ভীর ভাবে রমেশবাবু বলিলেন, "আমার বাড়ী ছাড়া বুঝি বড়লোকের বেড়াবার আর জায়গা নেই?"

স্বামীর এই অসঙ্গত প্রশ্নে গৃহিণী শুধু আশ্চর্য্য হইলেন না, বেশ বিরক্তও হইলেন; বিকৃতমুখে বলিলেন, "তা আবার

থাকবে না কেন, ঢের জায়গা আছে। কেন, তুমি কি ওকে আসতে বারণ করো ?"

রমেশবাবু নীরবে গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন।

গৃহিণী ভিজা কাপড়গুলা দড়িতে শুকাইতে দিতে-দিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এসব কথা তুমি বলছো কেন বলো তো ?"

গম্ভীরস্বরে রমেশবাবু বলিলেন, "আজ বদ্যিনাথবাবু কি বলছিলেন জানো ?"

—"কি বলছিলেন ?"

—"বলছিলেন, নলিনের সঙ্গে সতীর বিয়ে দিলে ভালো হয়।"

শুনিয়া গৃহিণী এমন একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া উঠিলেন যে, রমেশবাবু চম্‌কাইয়া উঠিলেন। তারপর প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনে তোমার খুব আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে—না ?"

গৃহিণী সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ গা, সত্যি ?"

মুখে একটু হাসি আনিয়া রমেশবাবু বলিলেন, "সত্যি হ'লে খুব ভালো হয় বুঝি ?"

—"ভালো ? ...না না, তাও কি কখনো হতে পারে ?"

—"কি হতে পারে না ? ...ভালো ?"

—"ওগো, না...আমি বিয়ের কথা বলছি।"

—"বিয়ে আর না হতে পারবে কেন ?"

গৃহিণী বলিলেন, "তা নয়, আমি বলছি ওরা এত বড়লোক, আমাদের মতন গরীবের মেয়েকে ঘরে নেবে—"

রমেশবাবু বলিলেন, "যদি নেয় তো আমাদের সৌভাগ্য বলবে তো। বড়লোকের দয়া কি সহজে পাওয়া যায় ?"

গৃহিণী একটু গর্ব্বের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "দয়া কি আর সহজে হয়েছে ? এর ভেতর আমাকে কত কল-কৌশল করতে হয়েছে জানো ?"

—"কল-কৌশল ?" অতিমাত্রায় বিস্মিত রমেশবাবু বলিলেন, "কি বলছো তুমি—সত্যি ?"

গর্ব্বস্ফীতকণ্ঠে গৃহিণী বলিলেন, "সত্যি নয় তো কি মিথ্যে বলছি ? ঐ যে নলিন যখন-তখন ছুটে আসে···সাধে কি আসে ? কত রকমে তার মন ভিজিয়েছি জানো ?"

রমেশবাবু বলিলেন, "না জানলেও আন্দাজ করতে পারছি। এই ধরো, রঙ্গ-রস, হাসি-তামাসা—"

কৃত্রিম কোপে তর্জ্জন করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "কথা শোনো একবার। আমি ওর সঙ্গে হাসি-তামাসা করতে পারি ?"

—"করলেই-বা। বড়লোকের মন ভেজাতে হ'লে তার পায়ে তেল পর্য্যন্ত মাখাতে হয়। নইলে বড়লোকের গরম মন কি সহজে নরম হয় ?"

—"সে-কথা ঠিক। কিন্তু আমাকে ততটা করতে হয় নি। এমনি মুখে আদর-যত্ন দেখিয়ে, পাঁচটা মিষ্টি কথা ব'লে

নলিনের মনটা খুব নরম ক'রে দিয়েছি। হাজার হোক, ছেলেমানুষ তো! কিন্তু মেয়েটা তোমার একেবারে ঢ্যাটা!"

—"কেন, মেয়েটা আবার কি করেছে?"

—"ও মোটে তাকে আমল দেয় না। সে ওর সঙ্গে কথা কয়বার তরে উস্‌খুস্‌ করে, ও কিন্তু কোন কথার জবাব দেবে না, তার ছাওয়া মাড়াবে না।"

গম্ভীর ভাবে রমেশবাবু বলিলেন, "তাই নাকি?"

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ গো। এই আজই দেখ না, আমি গিয়েছি কাপড় কাচতে এমন সময় নলিন এসেছে। সতী দাওয়ায় ব'সে আমার পূজোর ফুল বাছছিল, তাকে বসবার একখানা আসন পর্য্যন্ত দেয় নি। এসে দেখি, বাছা মেঝেয় ধূলোর ওপর ব'সে আছে। তারপর খুব বকতে, মুখটা গোঁজ ক'রে একদিকে চলে গেল। মেয়েটা যদি তেমন চালাক-চতুর হতো—"

শ্লেষভরাকণ্ঠে রমেশবাবু বলিলেন, "তাহ'লে তুমি অনেকদিন আগেই জমিদারের শাশুড়ী হয়ে পড়তে।"

সহাস্যে গৃহিণী বলিলেন, "আর তুমিই কোন্‌-না জমিদারের শ্বশুর হতে?"

রমেশবাবুকে নীরব দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "তা আগে আর পরে যখনই হোক্, জমিদারের শ্বশুর তো সেই হ'লে… জমিদারের শ্বশুর হওয়া নেহাত তোমার ভাগ্যে আছে।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া গম্ভীরকণ্ঠে রমেশবাবু বলিলেন, "না বড়বৌ, সেটা আমার ভাগ্যে নেই।"

বিস্ময়বিস্ফারিতদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাগ্যে নেই? সে কি গো! তবে যে তুমি বল্‌লে, ওঁরা—"

বাধা দিয়া রমেশবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, ওঁদের তাই মত। কিন্তু আমি ওঁদের মতে মত দিতে পাচ্ছি না।"

বিস্ময়রুদ্ধকণ্ঠে গৃহিণী বলিলেন, "কেন গা? তুমি মত দিতে পাচ্ছো না কেন?"

—"কেন, তা কি তুমি জানো না?"

—"আমি? আমি আবার কি জানি?"

—"সতীর চার বছর বয়স থেকে কার সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে সেটা ভুলে গিয়েছো না কি?"

একটু ভাবিয়া, অতীতের স্মৃতিটাকে স্মরণে আনিয়া গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোটবাবুর ছেলের সঙ্গে—কিন্তু…"

অবিচলিতকণ্ঠে রমেশবাবু বলিলেন, "এর মধ্যে আর 'কিন্তু' কিছু নেই বড়বৌ। হাজার কিন্তু দিয়েও সত্যকে মিথ্যা করা যায় না।"

গভীর বিস্ময়ে গৃহিণীর মুখখানা যেন একেবারে পাংশু হইয়া গেল। আশাভঙ্গের আশঙ্কায় ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাই ব'লে তুমি নলিনকে ছেড়ে সেই হতভাগা ছোঁড়ার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে?"

শান্তকণ্ঠে রমেশবাবু বলিলেন, "সত্যের কাছে হতভাগ্য-ভাগ্যবান্, ধনী-নির্ধন নেই বড়বৌ! অভাবে প'ড়ে চুরি-ডাকাতি করতে পারি, কিন্তু জমিদারের শ্বশুর হবার লোভে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারি না।"

গভীর নৈরাশ্যে গৃহিণীর মুখ আরও বিবর্ণ হইয়া আসিল। রমেশবাবু স্ত্রীর ম্লানমুখের দিকে চাহিয়া ধীরগম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "কথাটা শুনে তোমার বোধহয় খুব রাগ খুব দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু তোমার ঐ কল-কৌশল ক'রে একটা উচ্ছৃঙ্খল বালককে ভুলিয়ে তার হাতে মেয়ে দেবার সঙ্কল্প শুনে আমারও কম দুঃখ কম রাগ হয় নি জেনো।"

লজ্জায় গৃহিণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিলেন, তারপর বলিলেন, "তাহ'লে তুমি কি তাঁকে—জবাব দেবে ?"

রমেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করতে বলো ?"

কি করিতে বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া গৃহিণী আবার চুপ করিয়া রহিলেন।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রমেশবাবু বলিলেন, "তাহ'লে কি তোমার ইচ্ছে, যে, ওদের মতই মত দিই ?"

ভারীমুখে গৃহিণী বলিলেন, "আমি মেয়েমানুষ, আমার আবার ইচ্ছে-অনিচ্ছে কি আছে বলো!"

অভিমানে গৃহিণীর চোখ দুইটা এবার সজল হইয়া আসিল।

স্ত্রীর অশ্রুভারাক্রান্ত মুখের দিকে চাহিয়া রমেশবাবু

বলিলেন, "আরে, তুমি মেয়েমানুষ তা আমি জানি। কিন্তু মেয়েমানুষের কি ইচ্ছে-অনিচ্ছে থাকতে নেই ?"

বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন। সে-হাসিতে স্ত্রীর অভিমানের মাত্রাটা আরও বাড়িয়া উঠিল···মুখখানা ঘুরাইয়া লইয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন, "থেকেই আর কি হবে বলো! তোমরা পুরুষ—তোমরা যা বুঝবে, যা বলবে তাতেই মত দিতে হবে আমাদের। তোমাদের কথার ওপর আমাদের কথা কইতে যাওয়াই অন্যায়।"

হাস্যগম্ভীরস্বরে রমেশবাবু বলিলেন, "কথা কইতে যাওয়া মোটেই অন্যায় নয়, কথায়-কথায় রাগ-অভিমান করাটাই হচ্ছে অন্যায়।"

স্বামীর স্বরে সোহাগের আভাস পাইয়া স্ত্রীর অভিমানটা প্রথমে বাষ্পাকারে এবং পরে চোখের কোল ছাপাইয়া বর্ষণের উপক্রম করিল দেখিয়া রমেশবাবু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; অপেক্ষাকৃত কোমল-সুরে গৃহিণীকে প্রবোধ দিয়া জানাইলেন যে, নলিনের হাতে মেয়ে দিতে তাঁর যে একেবারেই অমত আছে তা নয়; তবে আগে যে কথাটা দিয়া রাখিয়াছেন কি করিয়া এখন তার অন্যথা করিবেন এইটাই তাঁর চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। গৃহিণী এখন যদি সৎপরামর্শ দিয়া এই ভার হইতে তাঁকে মুক্ত না করেন তা হইলে তাঁর আর উপায় নাই।

স্বামীর এই কাতরতায় গৃহিণী আর আপনার গাম্ভীর্য্য

বজায় রাখিতে পারিলেন না ; বেশ সহজ সরল ভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁর চিন্তার বিশেষ কারণ নাই। তিনি কথা দিয়াছেন বটে, কিন্তু কথা দিয়াছেন বলিয়া যে পথের ভিখারীর হাতে কন্যা-দান করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। তাছাড়া বর্ত্তমানে ছোটবাবুর যেরকম অবস্থা তাতে তিনি যে এখন ছেলের বিবাহ দিতে পারিবেন এমন মনে হয় না, সুতরাং অঙ্গীকার ভঙ্গ তাঁকে করিতেই হইবে, আর বয়স্থা মেয়েকে যে আমরাও আর বেশী দিন ঘরে রাখিতে পারিব তাও সম্ভব নয়। অগত্যা ছোটবাবুর কাছে জবাব লইয়া তাঁকে অন্যত্র চেষ্টা দেখিতে হইবে! এবং এ-অবস্থায় নলিন ছাড়িয়া অন্য চেষ্টা করায় কোন লাভ নাই।

লাভ যে নাই, বরং লোকসানই বেশী তা রমেশবাবুও জানিতেন। জানিলেও কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি নলিনের হাতে মেয়ে দিতে তাঁর একেবারেই ইচ্ছা হইতেছিল না! কিন্তু উপায় কি? মেয়ের বিবাহ দিতেই হইবে এবং তখন ছেলে খুঁজিয়া, টাকার যোগাড় করিয়া বিবাহ দিতে প্রাণান্ত হইবে। এমন অবস্থায় নলিনকে প্রত্যাখ্যান করা নির্ব্বুদ্ধিতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে! তবে একটা কথা এই যে, শপথ ভঙ্গ করা হইবে! তা, তিনি তো আর ইচ্ছা করিয়া তা করিতেছেন না— কন্যার ভবিষ্যৎটাও তো দেখিতে হইবে। পিতা তিনি… পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ-চিন্তা করা তাঁর অবশ্য কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য যে পালন না করে শাস্ত্রে তার নরক-বাসের উল্লেখ আছে।

শাস্ত্রের মত মানিতে হইলে···বয়স্থা কন্যাকে সুপাত্রে সম্প্রদান করিতে হইলে সত্যভঙ্গের মনোকষ্ট সহ্য করা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই ; অগত্যা রমেশবাবু গৃহিণীর মতটাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না আর বৈদ্যনাথবাবুকেও স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না।

*

*   *

নলিনের প্রকৃতিতে সত্যই এমন অবাঞ্ছিত উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল যা তার মতন অল্পবয়স্ক যুবকের পক্ষে একেবারেই অস্বাভাবিক। কিন্তু বয়স অল্প হইলে কি হয়, সে বড়লোকের ছেলে! জমিদারীর আয় ও আয়তন ক্ষুদ্র হইয়া গেলেও—জমিদার। সুতরাং জমিদার-সুলভ অহঙ্কার সেইদিন হইতে তার প্রতি কাজে প্রতি কথায় প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল যেদিন হইতে সে বুঝিতে পারিল এই জমিদারীর একমাত্র মালিক সে—গ্রামের বাকি সমস্ত লোকই অর্থে সামর্থ্যে সম্মানে তার অপেক্ষা হীন।

যে-সময় হইতে এই অহঙ্কারটা তার মনে জাগিয়া উঠিল তখন হইতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে আর চলিতে পারিল না। চলিতে গেলেই মনে অহঙ্কার আসিয়া জানাইয়া দিত যে, ইহাতে তার মর্য্যাদার হানি হইবে। জমিদার হইতেছে

প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা···সাধারণ লোক রাম-শ্যামের মতন অপরের ইচ্ছার অধীনে সে চলিতে পারে না। এমনকি, মাষ্টার-পণ্ডিতদের গুরুগিরিও তার কাছে অসহ্য।

অহঙ্কারের এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া নলিন যেদিন স্কুল ত্যাগ করিল সেদিন শ্যামাসুন্দরী তার কাছে কৈফিয়ৎ চাহিলে সে স্পষ্ট কথায় মাকে জানাইয়া দিল যে, তার চাকরের সমান মাহিনা পায় যারা তারা যে চোখ রাঙাইয়া কথা বলিবে···একটু ত্রুটিতেই কাণে হাত দিতে আসিবে এ একেবারেই অসহ্য!

পুত্রের এই স্পর্দ্ধার কথায় মা চিন্তিত হইলেন। তিনি বৈদ্যনাথকে ইহার প্রতিকারের জন্য অনুরোধ করিলে, বৈদ্যনাথ তাঁকে জানাইলেন যে, নলিন যখন গোঁ ধরিয়াছে তখন সে কিছুতেই স্কুলে যাইবে না। আর এখানকার স্কুলের মাষ্টার-পণ্ডিতগুলাও নিতান্ত অসভ্য। তাদের একটু বুদ্ধি-বিবেচনা থাকিলে কখনো জমিদারের ছেলের কাণে হাত দিতে সাহস করিত না। সুতরাং এক্ষেত্রে নলিন যে কিছু অন্যায় করিয়াছে এমন মনে হয় না।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "কিন্তু চোরের ওপর রাগ ক'রে মাটিতে ভাত খেলে তো চলবে না; ইস্কুলে না গেলে ও লেখাপড়া শিখবে কি ক'রে?"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "ওর ইচ্ছে, কলকাতায় থেকে এরপর কলেজে পড়বে!"

শঙ্কিত হইয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তা হবে না দাদা, চোখের আড়ালে আমি ওকে রাখতে পারবো না। তাছাড়া সে সহর জায়গা, সেখানে ওকে বিশ্বাস নেই।"

একটু চিন্তা করিয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন, "তাহ'লে এক কাজ করা যাক্,একজন মাষ্টার রেখে দিই,সে বাড়ীতে ব'সে পড়াবে।"

অগত্যা শ্যামাসুন্দরী এই প্রস্তাবেই সম্মতি দিলেন আর নলিনেরও ইহাতে আপত্তি রহিল না। তখন মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে একজন বি-এ পাস-করা মাষ্টার নলিনের শিক্ষার জন্য রাখা হইল।

মাষ্টার মহাশয় সরকার হইতে মাসে-মাসে চল্লিশ টাকা মাহিনা ঠিকই আদায় করিতে লাগিলেন, কিন্তু নলিনের শিক্ষার কি হইতেছে না হইতেছে সে-খবর কেউ রাখিল না। শ্যামাসুন্দরী আপনার পূজা-আহ্নিক লইয়া ব্যস্ত...বৈদ্যনাথ জমিদারীর চিন্তা আর মামলা-মকদ্দমার তদ্বিরে তন্ময়, তাঁর নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় নাই...সুতরাং সুযোগ বুঝিয়া মাষ্টার মহাশয় গুরুগিরির কঠোর কর্ত্তব্য হইতে অবসর লইয়া সাধারণ পারিষদের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া পরামানন্দে শিষ্যকে বিলাসিতার অমৃতানন্দ পরিবেশন করিতে লাগিলেন, সেদিকে কেউ ভ্রূক্ষেপও করিল না।

শুধু মাষ্টার ভূপতিবাবু নয়, গ্রামের অনেক নবীন-প্রবীণের দলই নলিনবাবুর পারিষদের পদ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। তাদের মধ্যে কেউ নলিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব-বন্ধন

সুদৃঢ় রাখিবার জন্য, কেউ-বা হিতোপদেশ দিয়া আর আশীর্ব্বাদ করিয়া নলিনবাবুকে কৃতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে সকালে-সন্ধ্যায় নূতন জমিদারের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল এবং এই অল্পবয়স্ক যুবকের মধ্যে প্রবীণোচিত বিজ্ঞতা দেখিয়া আনন্দধ্বনিতে বাবুর বৈঠকখানা সরগরম করিয়া তুলিত।

এরকম স্তুতিবাদের প্রভাবে বড়-বড় মনীষির মাথা ঘুরিয়া যায় তা উনিশ বছরের যুবা নলিন। কাজেই ইহার পরিণাম সচরাচর যা হইয়া থাকে তাই হইল। একটু-একটু করিয়া নলিন অধঃপতনের পিছল-পথে নামিতে লাগিল—অসংযত স্বেচ্ছাচার অত্যাচার ইত্যাদি কিছু আর তার বাকি রহিল না।

বৈদ্যনাথ যে ইহা জানিলেন না তা নয়; জানিয়াও কিছু বলিলেন না, বা বলা আবশ্যক মনে করিলেন না। একজন প্রবীণ কর্ম্মচারী এ-সম্বন্ধে বৈদ্যনাথবাবুর নিকট অনুরোধ করিলে তিনি গম্ভীরভাবে তাঁকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে,"বড়লোকের ছেলে-রাই চিরকাল বড়মানুষি ক'রে থাকে, গরীবের ছেলেরা নয়···"

অনুযোগকারী কর্ম্মচারী বৈদ্যনাথবাবুর এ-উত্তরে শুধু আশ্চর্য্য হইল না, তাঁর এই সদর্প-উক্তির মধ্যে কি যেন একটা দুরভিসন্ধির ছায়া দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। কারণ বৈদ্যনাথবাবুই তখন জমিদারীর সর্ব্বেসর্ব্বা; নলিন নামে মালিক মাত্র, জমিদারী-সংক্রান্ত কোন কাজের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না—সম্পর্ক রাখিতেও সে চাহিত না—আমোদ-প্রমোদে উন্মত্ত যুবক

তার প্রয়োজনমত টাকা পাইলেই খুশী হইত। বৈদ্যনাথও সাধ্যমত তাকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

একদিন এক প্রজা আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল, নায়েব মহাশয় মিথ্যা বাকি-খাজনার দায়ে তাকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। তার অপরাধ—সে নায়েব মহাশয়ের পুত্রের অন্নপ্রাশনে আট আনার বেশী এক টাকা চাঁদা দিতে স্বীকৃত হয় নাই। এই অপরাধে তিনি মিথ্যা-খাজনার জের টানিয়া তার ঘটি-বাটি গরু-বাছুর পর্য্যন্ত বেচিয়া লইবার উপক্রম করিয়াছেন। প্রজার কান্না ও আকুলতায় নলিনের মন গলিয়া গেল, সে প্রজাকে লইয়া মামাবাবুর কাছে হাজির হইল।

বৈদ্যনাথ নলিনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, নায়েবের কোন দোষ নাই। ঐ লোকটা ঐরকমই দুষ্ট, ন্যায্য খাজনা ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিয়াছে তাই নায়েব মামলা বাধাইয়াছেন, দুষ্ট প্রজাকে এভাবে শাসন না করিলে খাজনা আদায় হয় না।

নলিন এ-কথা মোটেই বুঝিতে চাহিত না, মামলা তুলিয়া লইবার জন্য মামাবাবুকে বারবার অনুরোধ করিল।

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "কিন্তু কার অন্যায় কার ন্যায় তা তো মুখের কথায় বোঝা যাবে না, তাহ'লে খাতাপত্র দেখ।"

বৈদ্যনাথের আদেশে কর্ম্মচারীরা খাতাপত্র আনিয়া হাজির করিল। সেই রাশীকৃত খাতাপত্র দেখিয়া নলিনের মুখ শুকাইয়া গেল এবং মামাবাবুর বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া সে পালাইয়া আসিল। তারপর হইতে সে আর কোন প্রজার

অভিযোগ শুনিত না, কেউ অভিযোগ করিতে আসিলে সোজা মামাবাবুর কাছে পাঠাইয়া দিত। তা সত্ত্বেও যে নাছোড়বান্দা হইয়া বেশী কাঁদাকাটা করিত তাকে চাবুক দেখাইত।

ক্রমে ছোট তরফের সঙ্গে মামলায় অনেক সম্পত্তি বন্ধক পড়িল, অনেক বন্ধকী-সম্পত্তি সুদের দায়ে বিকাইয়া যাইবার উপক্রম হইল, কিন্তু নলিন সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না; সে সমান বড়মানুষি-চালে চলিয়া, ইয়ার-বন্ধু লইয়া আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিল।

কিন্তু শুক্‌না আমোদ আর কতদিন ভালো লাগে? কাজেই সেটাকে পরিবর্ত্তন করিয়া লইবার জন্য ইয়ার-বন্ধুদের চেষ্টা হইল এবং সমবেত চেষ্টার ফলে প্রতিদিন সকালে-বিকালে নলিন পারিষদবেষ্টিত হইয়া পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল আর বৈকালের দিকে যেসব পুকুরে গ্রামের মেয়েরা জল আনিতে বা কাপড় কাচিতে যায় সেইসব পুকুরে ছিপ ফেলিয়া মাছ-ধরা সুরু করিয়া দিল।

পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইবার সময়েও বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইত না; গ্রামের ইতর-ভদ্র সকলের বাড়ীতে ঢুকিয়া তাদের সুখ-দুঃখের খবর লইবার চেষ্টা করিত। জমিদারপুত্রের এই সহৃদয়তা দেখিয়া অনেকেই তার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না; কিন্তু অনেক সন্দিগ্ধমনাঃ ব্যক্তি তার লোলুপ দৃষ্টি হইতে নিজেদের মানমর্য্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য তার সাড়া পাইলেই ভয়ে-ভয়ে ঘরের দরজায় খিল আঁটিয়া দিত এবং হাজরাদের

চণ্ডীমণ্ডপে, শিবমন্দিরের আটচালায় সমবেত হইয়া নলিনবাবুর সহৃদয়তা সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করিত।

এইসব সমালোচনা যে শ্যামাসুন্দরী শুনিতে পাইতেন না তা নয় : শুনিয়াও তাঁকে চুপ করিয়া থাকিতে হইত। কারণ, প্রতিকারের উপায় তাঁর হাতে ছিল না। নলিন তখন এমন শিশু ছিল না যে, ধমক দিয়া বা জোর করিয়া তাকে শাসন করিবেন। ছেলে এখন সাবালক, সম্পত্তির মালিক, জোর দেখাইতে গেলে সে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়। বেশী তিরস্কার করিলে অভিমানে গৃহত্যাগে উদ্যত হয়। অগত্যা শ্যামাসুন্দরীকে চুপ করিয়াই থাকিতে হইল। কিন্তু পুত্রকে অধঃপাতে যাইতে দেখিলে মায়ের পক্ষে একেবারে চুপ করিয়া থাকা মুস্কিল। মা খুব উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন আর মধ্যে-মধ্যে বৈদ্যনাথকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। বৈদ্যনাথ কিন্তু তাঁকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ছেলেবয়সে অনেকেই এমন উচ্ছৃঙ্খল হয় ; একটু বয়স হইলেই এসব দোষ শুধরাইয়া যাইবে। কত বড়লোকের ছেলে নলিনের মতন বয়সে মদ-ভাঙ ইত্যাদি লইয়া উন্মত্ত হইয়াছে ; বাপের জমিদারী নীলামে তুলিয়া দিয়া জেলখানার অতিথি হইয়াছে ; তাদের তুলনায় নলিন তো হীরার টুক্‌রা ছেলে। তাছাড়া বড়লোকের ছেলে একটু-আধটু বড়মানুষী-চাল না দেখাইলে লোকে তাকে মানিবে কেন ?

অগ্রজের আশ্বাসবাক্যে আশ্বস্ত হইলেও শ্যামাসুন্দরী উৎকণ্ঠিত চিত্তেই দিন কাটাইতে লাগিলেন।

*

* *

সেদিন আহ্নিক-পূজার শেষে নলিনের মঙ্গল কামনায় ইষ্টদেবের উদ্দেশে প্রার্থনা জানাইবার পর জপের মালা হাতে শ্যামাসুন্দরী ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইতেছেন এমন সময় শুনিলেন, নীচের তলায় সৈরভী দাসীকে বামাকণ্ঠে কে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "মাঠান কুথাকে আছেন গা মেয়ে?"

বারান্দার রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া শ্যামাসুন্দরী দেখিলেন, তেনা বাউরীর বৌ আসিয়া মাথার লম্বা ঘোমটা তুলিয়া উঠানের একপাশে দাঁড়াইয়াছে।

অনেকদিন পরে বাউরী-গিন্নী আসিয়াছে, নিশ্চয় কিছু খবর আছে ভাবিয়া উনি তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিলেন।

মাঠান্‌কে দেখিয়াই প্রবীণা বাউরী-গিন্নী আভূমি প্রণত হইল, তারপর উঠিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, "এই আপনকার কাছকেই এনু মাঠান্! আপনি যদি রক্ষে করো তবেই রক্ষে পাই, নইলে এবারে গরীবের মান ইল্লোত হয়ে যাবেক্, আর তাজা রইবেক্ নি গো, কলঙ্কির পাপের ভয়ে হ্যাথাকে আর তিষ্ঠুতে লারবো মাঠান্, ভিটে থুয়ে ভাগ্‌তে হবেক্। মা গো মা, ঘেন্নায় মরি, শুনলে কণ্যে আঙ্‌গুল দিতে হয়—ওমা, ই-কি কথা গো—য়্যাঁ?"

শ্যামাসুন্দরী এইসব ইতর শ্রেণীর সরল গ্রাম্য-প্রজাদের খুব ভালো করিয়াই জানেন। অত্যন্ত বিপদে না পড়িলে

ইহরা কখনো তাঁর কাছে নালিশ জানাইতে আসে না, তাই বলিলেন, "কথাটা কি তাই বল্ আগে! কি হয়েছে তোর?"

বাউরীবৌ বলিল, "কও কথা, আমার আবার হবেক্ কি গো মাঠান্! 'আপুনি বলো কি গো—য়্যাঁ? আমার তিন কাল গেছে, এক কাল আছে, আমার কথা লয় গো মাঠান, আমার কথা লয়। ঐ যে আমার বেটার বৌ গো! কটা চামড়া দেখে তখন ঘর্কে লিয়ে এন্নু, সক্কলে ধন্যি-ধন্যি কর্লেক্ গো, যে, এমন রঙ্ বাগ্দী-বাউরীদের ঘরকে কেউ জনমে দ্যাখেনি! তা পোড়া সেই রঙ্টাই কি কালসাপ হয়ে দংশালেক্ মাঠান্? আপনকার কাছকে তবে বলি এই শুনো" বলিয়া সশঙ্ক-সরমে চারিদিকে চোখ বুলাইয়া লইয়া বাউরীবৌ বলিল, "তাই কি পোড়া উঁচু জাত গা, যে, আপনকার কণ্যের কাছে মুখ লিয়ে গিয়ে ইসারায় বল্বোক্ আর আপুনি বুঝে লিবে? আবার পোড়া ছোঁয়াচের ভয় আছেক্!"

শ্যামাসুন্দরী চিন্তিত হইলেন; বলিলেন, "না না, ছোঁয়াচের ভয় নেই তোর, তুই একটু বোস এখানে, আমি পাটের কাপড় ছেড়ে আর মালা রেখে এখনি আসছি, এসে তোর সব কথা শুনবো।"

—"তাই আপুনি এসো। সবুর আমার সইবেক্, তার লেগে লয়, তবে ত্বরা ক'রে আস্বেক্ মাঠান্, আমি চুলায় হেঁড়ে চাপায়ে ভাব্নু, দেখি, মাঠান্ কি পিতিকার করেন, তাই ছুটে এন্নু!"

বাউরীগিন্নীকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। শ্যামাসুন্দরী তখনি ফিরিয়া আসিয়া ওকে ডাকিয়া খিড়কি-পুকুরের শান-বাঁধানো ঘাটে গিয়া বসিলেন, বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া বাউরীবৌ-এর ঘরের অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনিতে-শুনিতে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন, ভাবিলেন, এও কি সম্ভব? কিন্তু ইহারা তো মিথ্যা বলিবে না—মিথ্যা ইহারা জানে না। তারপর নানা ভাবে বাউরীবৌকে অভয় দিয়া সান্ত্বনা করিয়া বিদায় দিয়া উনি নিজের ঘরে গিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন—তা হইলে এখন উপায়? না, উপায় কিছুই নাই। যে রক্ষক, সেই যদি ভক্ষক হয় তা হইলে আর রক্ষা পাইবার অন্য উপায় কি আছে? এক উপায় ছিল, কিন্তু সেদিকেও অন্ধকার। প্রিয়নাথ কি এ-বিপদ শুনিয়া ছুটিয়া আসিবে? হয়তো শুনিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিবে, বলিবে, ঠিক হইয়াছে। আবার ভাবিলেন, হয়তো তা নাও বলিতে পারে। আর বলিলেও তার বংশের এই কলঙ্ক-কাহিনীর কথা প্রকাশ হইবার আগে তার সঙ্গে পরামর্শ করা ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় আর কি হইতে পারে? ভাবিতে-ভাবিতে সেদিনের কথা মনে পড়িল:

…গোধূলির আসন্ন-সন্ধ্যায় প্রিয়নাথ যেদিন জন্মভূমির মায়ার বাঁধন ছিন্ন করিয়া পরদিন প্রাতে বন্ধুর আশ্রয়ে পাঁচক্রোশ দূরে রাজহাটী চলিয়া যাইবার জন্য মোটঘাট বাঁধিতেছিলেন, সেইসময় শ্যামাসুন্দরী তাঁকে বাধা দিতে গিয়া, রাধুর সঙ্গে সতীর বিবাহের প্রস্তাব তুলিয়া রাজী

করাইতে না পারিয়া শেষে নলিনের সঙ্গে সতীর বিবাহ দিয়া স্বামীর শেষ আদেশ পালন করিবেন জানাইয়া দেবরের মত জানিতে চাহিয়াছিলেন···প্রিয়নাথ তখন হাসিতে-হাসিতে বলিয়াছিলেন, ''বেশ, তাই হোক্।'

শুনিয়া তিনি রাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া পাল্কীতে উঠিলেও বাড়ী গিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। সারা রাত্রি বিনিদ্রঅবস্থায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া ভোরে সুর্য্যোদয়ের আগেই আবার পাল্কীতে গিয়া যখন দেখিলেন, মোটঘাট সব গরুরগাড়ীতে তুলিয়া দিয়া প্রিয়নাথ আর আন্নাকালী উভয়ে বিদায় লইবার আগে গৃহদেবতাকে শেষ প্রণাম-নিবেদন জানাইতেছে আর ছলছল চোখে রাধু একপাশে দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিতেছে, তখন আর তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া সবলে রাধুর হাতটা চাপিয়া ধরিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তারপর উভয়ে অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে মাথা তুলিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সব জিনিস তো গাড়ীতে তুলেছো, কিন্তু ওই 'রামদা'টা তুলতে ভুলে গেছ ঠাকুরপো। ওইটে তুলে নিয়ে আগে আমার বুকে বসিয়ে দাও, তারপর আমার মরা-মুখ দেখে শুভযাত্রা করো, ফল ভালো হবে।"

শুনিয়া স্বামী-স্ত্রীর অশ্রু-ভরা চোখের নীচে বিষাদ-ভরা মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে-যাত্রা তাঁদের আর রাজহাটী যাওয়া হয় নাই। বৌঠান্‌কে প্রণাম করিয়া আবার মোটঘাট ঘরে তুলিয়া তখন হইতে প্রিয়নাথ সেই বাড়ীতেই রহিয়া

গেছেন। ···না না, ঠাকুরপো কখনো এত নিষ্ঠুর হইবে না যে, তার ঘরের কেলেঙ্কারীর এ-খবর পাইয়াও নিশ্চিন্ত থাকিবে···

অনেক চিন্তার পর শ্যামাসুন্দরী অন্ধকারে আশার আলোর একটু ক্ষীণ রশ্মি দেখিতে পাইয়া কি এক নূতন আশার আশায় আবার কতকটা আশ্বস্ত হইলেন।

*

* *

—"রাধু!"

—"কেন মা?"

—"একবার যাবি বাবা?"

—"কোথায় মা?"

এ-কথার উত্তর না পাইয়া রাধু আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যেতে হবে—বাজারে?"

—"না।"

—"তবে ডাক্তারবাড়ী?"

—"ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়ে কি হবে? ডাক্তার তো মিনি-পয়সায় ওষুধ দেবেন না!"

ঘাড় নাড়িয়া রাধু বলিল, "হ্যাঁ, মিনি-পয়সায় ওষুধ দেবে!

কাল চারগণ্ডা পয়সা নিয়েই ওষুধ দিতে চায় না, বলে—'চার আনায় এক শিশি জল পাওয়া যায়, ওষুধ পাওয়া যায় না।' আমি তো ফিরেই আসছিলাম, শেষে বুড়ো কম্পাউণ্ডারটা চোখ টিপে আমায় ডেকে, চার আনা নিয়েই ওষুধ দিলে।"

রাধুর মুখখানা বিষাদে মলিন হইয়া আসিল।

আন্নাকালী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কাল চার আনা নিয়ে ওষুধ দিতে চায় নি, আজ কিন্তু চারটে পয়সাও নেই।"

ভারীমুখে রাধু বলিল, "তাহ'লে আজ আমি শুধু-হাতে যেতে পারবো না···গেলে হয়তো তাড়িয়ে দেবে।"

আন্নাকালী কিছুক্ষণ নীরবে থাকার পর দুঃখের আবেগটা কমিলে ধীরে-ধীরে বলিল, "কিন্তু ওষুধ না হ'লে যে আর চলবে না বাবা।"

রাধু বলিল, "না চলে তো আর আমি কি করবো?"

—"কোথাও থেকে আটগণ্ডা পয়সার যোগাড় করতে পারবি না?"

—"কোথা থেকে যোগাড় করবো? কেউ কি ধার দিতে চায়? আর ঘটি-বাটি—সে আমি বাঁধা দিতে যেতে পারবো না। সেদিন তো কেলোর বাপ কত কথা শুনিয়ে দিলে। বলে—সোনারূপো নেই, রোজ-রোজ পেতল-কাঁসা রেখে টাকা···টাকা অমনি খোলামকুচি!"

তাড়াতাড়ি ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়া আন্নাকালী চাপা-গলায় বলিল, "চুপ্ চুপ্, জেগে থাকে তো শুন্‌তে পাবে—শুনলে আর ওষুধই খাবে না।"

রাধুও তা জানিত, তাই কথায়-কথায় আনমনে বলিয়া ফেলার অসতর্কতায় লজ্জিত হইয়া ভয়ে-ভয়ে ঘরের দিকে শঙ্কিতদৃষ্টিতে চাহিল। ঘরের একপাশে মলিন শয্যায় প্রায় বিছানার সঙ্গে মিশিয়া প্রিয়নাথ মুদিতনেত্রে পড়িয়াছিলেন। কয়েকদিন হইতে আমাশয়ে ভুগিয়া-ভুগিয়া একেবারে উত্থানশক্তি রহিত হইলেও চিকিৎসা করাইবার সঙ্গতি ছিল না বলিয়া তিনি রোগটাকে উপেক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। কিন্তু রোগ তাঁর অবস্থা বুঝিয়া চলিল না; চিকিৎসার অভাবে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই উঠিতে লাগিল। শেষে আমাশয়ের সঙ্গে জ্বর আসিয়া আক্রমণ করিল।

রোগের প্রথম অবস্থা হইতেই উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য আন্নাকালী ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু প্রিয়নাথ নানারকম ওজর দেখাইয়া স্ত্রীকে বুঝাইয়া শান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এবার কিন্তু আন্নাকালী আর চুপ করিয়া রহিল না; সে ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিল। কিন্তু ঘটি-বাটি বন্ধকের পয়সায় আর কতটুকু চিকিৎসা হইতে পারে? ভিজিটের আশা না থাকায় ডাক্তার রোগীর বাড়ীতে পদার্পণ করিলেন না; শুধু রাধুর মুখে রোগীর অবস্থা শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। তবে তিনি এটুকু দয়া

করিলেন যে, ঔষধের মূল্য লইলেও, ব্যবস্থার মূল্য একটি পয়সাও লইলেন না।

ঘটি-বাটি বন্ধক-বিক্রয়ের খবর পাইয়া প্রিয়নাথ ঔষধ খাইতে চাহিলেন না। আন্নাকালী অনেক সাধ্য-সাধনা অনুনয়-বিনয়েও স্বামীকে রাজী করাইতে না পারিয়া শেষে যখন তাঁর পায়ে মাথা খুঁড়িতে লাগিল তখন বাধ্য হইয়া প্রিয়নাথকে ঔষধ খাইতে হইল।

কিন্তু আন্নাকালী যেদিন বুঝিল, ঔষধের জন্য বাঁধা দিবার মতন থালা ঘটি-বাটিরও অভাব হইয়া পড়িয়াছে সেদিন গভীর নৈরাশ্যে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। এ কি কম আক্ষেপের কথা! যার পয়সা একদিন কত লোকে খাইয়াছে, আজ পয়সার অভাবে সে রোগে একবিন্দু ঔষধ পাইবে না!

ক্ষোভে দুঃখে আন্নাকালীর চোখে জল আসিল।

অনেক চিন্তার পর শেষে নৈরাশ্যের গভীর অন্ধকারের মধ্যে সে আশার একটু ক্ষীণ রশ্মি দেখিতে পাইল। বড়গিন্নীর কাছে একবার রাধুকে পাঠাইলে হয় না? এমন বিপদের সময় তিনি কি চুপ করিয়া থাকিতে পারিবেন? তাঁকে আন্নাকালী যতটা চিনিয়াছে, বুঝিয়াছে তিনি কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না; খবর পাইলে হয়তো নিজেই ছুটিয়া আসিবেন। কিন্তু সে-আসায় কতটা অপমান এবং সেই অপমানটা মাথা পাতিয়া লইতে প্রিয়নাথ স্বীকৃত হইবেন কি না এখন এইটাই হইতেছে চিন্তার বিষয়। কিন্তু জীবন আগে, না মান-অপমান

আগে ? প্রাণে বাঁচিলে তো মান-মর্য্যাদা সব-কিছু। প্রাণই যদি গেল তবে শুক্‌না মান-মর্য্যাদা লইয়া কি লাভ হইবে!

স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য আন্নাকালী অকুণ্ঠিতচিত্তে অপমানটাকে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত হইল এবং রাধুকে বড়গিন্নীর কাছে পাঠাইবার জন্য আহ্বান করিল। কিন্তু আহ্বান করিয়াও তাকে কথাটা বলিতে সঙ্কোচে স্বর বাহির হইতে চায় না....কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। এই কয়দিন আগে প্রিয়নাথ তাকে তাঁর কঠোর আদেশ জানাইয়া দিয়াছেন যে, কোন কারণেই যেন ওখানে না যাওয়া হয়। তবে আজ আবার কেমন করিয়া স্বামীর সে-আদেশ লঙ্ঘন করিয়া রাধুকে সেখানে পাঠাইবে ভাবিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িল এবং রাধু যখন ঘটি-বাটি বাঁধা দিতে যাইতে পারিবে না বলিল তখন এই অবসরে কথাটা পাড়িবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল....একটু রাগ দেখাইয়া বলিল, "জিনিসপত্র বাঁধা দিয়ে পয়সা আনতে পারবি না, মিনি পয়সায় ওষুধও আসবে না, তাহ'লে এখন আমি কি উপায় করবো বল্ দেখি ?"

গম্ভীর ভাবে রাধু বলিল, "তা, আমিই-বা কি করবো ?"

তিরস্কার করিয়া আন্নাকালী বলিল, "এত-বড় ছেলে, কি করবো ব'লে ব'সে থাক্‌বি, একটা উপায় করতে পারবি না ?"

ম্লানমুখে রাধু বলিল, "কি উপায় করবো—বলো ?"

আন্নাকালী বলিল, "সে উপায়ও আমায় ব'লে দিতে হবে ? বেশ, তাহ'লে তুই এক কাজ কর্।"

—"কি কাজ ?"

—"একবার তোর বড়মার কাছে...."

ঐটুকু শুনিয়াই রাধু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন চমকিয়া উঠিয়া এমন দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিল যে, আন্নাকালীকে মাথা নীচু করতে হইল।

রাধু গম্ভীর গলায় ডাকিল, "মা !"

মা শুধু লজ্জাকাতর-দৃষ্টিটা তুলিয়া একবার ছেলের মুখের দিকে চাহিল। মায়ের সেই লজ্জানত-দৃষ্টির সামনে রাধু নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

নীরবে থাকিলেও রাধু মনে-মনে যা ভাবিতেছিল, মুখ ফুটিয়া সে-কথা জিজ্ঞাসা করিল ; বলিল, "সত্যিই তুমি যেতে বলো মা ?"

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে আন্নাকালী বলিল, "সাধ ক'রে কি বলছি রে ! না গেলে ওঁকে বাঁচাবো কি ক'রে ?"

মায়ের কাতরতায় রাধু আর স্থির থাকিতে পারিল না ; ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু বাবা শুনলে কি বলবেন ?"

—"খুবই রাগ করবে। কিন্তু সেই ভয়ে কি এখন আমাদের চুপ ক'রে ব'সে থাকা উচিত ?"

—"তা নয়, কিন্তু যাতে বাবার মাথা হেঁট হয় তেমন কাজ করাও উচিত নয়।"

—"তা তো নয়, কিন্তু জীবন আগে, না মান-সম্মান আগে ?"

—"আমার মনে হয়, মান-সম্মানই আগে।"

বালকের এই সম্মান-জ্ঞানের প্রভাবে আন্নাকালীকে পরাভব মানিতে হইল। রাধুর উত্তরের প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া অতঃপর কি করা যায় তাই ভাবিতে লাগিল।

ছোট ছেলে সতু এতক্ষণ বাহিরে খেলা করিতেছিল; এইসময় সেখানে আসিয়া আবদারের সুরে বলিল, "মা, খিদে...."

আন্নাকালী এতক্ষণ শুধু স্বামীর রোগের কথা ভাবিতে-ভাবিতেই জগৎ বিস্মৃত হইয়াছিল; ঘরে যে একমুঠা চাল বা অন্য কোন আহার্য্য নাই যা দিয়া একবেলা চালাইতে কিম্বা কচি ছেলেটাকে খাওয়াইতে পারে সে-কথাটা মনেই ছিল না। সতু আসিয়া সহসা সেই বিস্মৃতপ্রায় কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতেই গভীর দুঃখে ও নৈরাশ্যে আন্নাকালী আর আপনাকে স্থির রাখিতে পারিল না; কাঁপিতে-কাঁপিতে অবসন্ন দেহ লইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল।

মায়ের অবস্থা দেখিয়া রাধু শঙ্কিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হলো মা?"

আন্নাকালী জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টায় বলিল, "এমন কিছু না, মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠলো কি না—"

সতু মাকে আর কিছু বলিতে না দিয়া,মায়ের হাঁটুটা চাপিয়া ধরিয়া নিজেদের আবেদন জানাইল, "কৈ, খেতে দাও?"

এবার রাধুও আর স্থির থাকিতে পারিল না। মায়ের নিরুপায় অবস্থার কথা ভাবিয়াই বোধহয় বলিয়া উঠিল,

"আচ্ছা মা, আমি বাবার ওষুধের যোগাড় কচ্ছি, তুমি উঠে ওকে খেতে দাও।"

মা কিন্তু উঠিল না। উঠিয়া কি করিবে? ঘরে কি আছে যে ছেলেকে খাইতে দিবে? কিন্তু শিশু সেসব কি জানে! সে আবার বলিল, "ভাত দাও না মা···বড্ড খিদে পাচ্চে যে···"

মায়ের মুখ দিয়া কথা সরিল না, শুধু চোখের পাশ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

মায়ের চোখে জল দেখিয়া রাধু ভারীগলায় ডাকিল, "মা!"

আন্নাকালী এবার মুখ তুলিয়া বাষ্পরুদ্ধদৃষ্টিতে ছেলের দিকে চাহিল।

রাধু জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে কি কিছুই নেই মা?"

দীর্ঘনিঃশ্বাসে বুকটাকে কাঁপাইয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে আন্নাকালী উত্তর করিল, "ওরে, না—না—না। ঘরে এমন একটি লক্ষ্মীর কণা নেই যা দিয়ে সতুকে ঠাণ্ডা করি।"

—"একমুঠো পান্তা ভাত?"

—"চালের তরে কাল রাত্রে যে হাঁড়ি চড়ে নি বাবা!"

—"মুড়ী একমুঠো?"

—"যে ক'টি ছিল তা সকালে উঠে সতু খেয়েছে।"

—"তাহ'লে ও এখন কি খাবে? বাবারই-বা কি খাওয়া হবে?"

—"কি আর খাবে বল্!"

চিন্তার ছায়া পড়িয়া রাধুর মুখখানা অন্ধকার করিয়া দিল ; বলিল, "এতক্ষণ তো আমায় এ-কথা বলো নি মা ?"

—"বল্‌লে, ছেলেমানুষ তুই কি করতিস্ ?"

—"তা বটে। ...আচ্ছা, ভিক্ষে ? ভিক্ষে ক'রে দু'মুঠো চাল এনেও তো সতুর মুখে, বাবার মুখে দিতে পার্‌তাম।"

এত দুঃখেও আন্নাকালী না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। অধরোষ্ঠ-তির্য্যকরেখার প্রথমার্দ্ধে মলিন-হাসির দৈন্য আনিয়া বলিল, "তুই ভিক্ষে করবি রে রাধু ?"

জোরগলায় রাধু বলিল, "হ্যাঁ করবো। খেতে না পেলে মানুষ চুরি-ডাকাতি করে আর আমি ভিক্ষে করতে পারবো না ? খুব পারবো। ...আয় সতু, আমি খাবার দেবো তোকে !" বলিয়া সতুর হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতে রাধু বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

আন্নাকালীর বুকের হাড়গুলাতে মোচড় দিয়া যে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইল তা অনাহারক্লিষ্ট অনাথ সন্তানের জননী ভিন্ন জগতে আর কেউ বুঝিবে না।

ঘরের ভিতর হইতে প্রিয়নাথ ডাকিলেন, "ছোটবৌ !"

এতক্ষণে আন্নাকালীর চমক ভাঙিল।

—"রাধু কোথায় গেল ছোটবৌ ? ...ওষুধ আন্‌তে ?"

অন্যদিকে মুখ রাখিয়া আন্নাকালী উত্তর দিল, "না।"

প্রিয়নাথ স্ত্রীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে বুঝি থালা-ঘটি বেচতে গেছে ?"

ঈষৎ তর্জ্জনের স্বরে আন্নাকালী বলিল, "হ্যাঁ, আমরা থালা-ঘটি বাসন-কোসন সর্ব্বস্ব বেচেই তো খাচ্ছি!"

ম্লানহাসি হাসিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "সর্ব্বস্ব থাকলে তো বেচে খাবে—সর্ব্বস্বের মধ্যে তো ঐ পেতল-কাঁসা ক'খানা পড়ে আছে। তা, ওগুলো বেচেও যদি নিজেরা খেতে পেতে তাহ'লে বেচা কতকটা সার্থক হতো।"

স্বামীর দিকে চাহিয়া আন্নাকালী বলিল, "বেচে নিজেরা খাচ্ছি না তো কি পরকে খাওয়াচ্ছি?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "একরকম পরকেই খাওয়ানো হচ্ছে বৈ কি···ডাক্তারের পেট ভরাচ্ছো।"

এবার একটু রাগের সুরে আন্নাকালী বলিল, "সর্ব্বস্ব বেচে-কিনে শুধু নিজেদের পেট ভরালেই ঠিক হতো বুঝি?"

প্রিয়নাথ একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, "অনেকটা ঠিক হতো গো! বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আর কচি ছেলের খিদের কান্না সহ্য করতে হতো না!"

চোখের জল সামলাইবার জন্য আন্নাকালী এবার মুখটা ফিরাইয়া লইল। প্রিয়নাথ নীরবে পড়িয়া রহিলেন, খানিক পরে চোখ মেলিয়া ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সতু খিদে পেয়েছে ব'লে কাঁদছিল না?"

'আন্নাকালী বলিল, "ওর কথা ছেড়ে দাও, ওর চব্বিশ ঘণ্টাই খিদে···চব্বিশ ঘণ্টাই কান্না····"

দীর্ঘনিঃশ্বাসটাকে চাপিয়া দুঃখগম্ভীরস্বরে প্রিয়নাথ বলিলেন,

"কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাইশ ঘণ্টা যে ওকে অনাহারে থাকতে হয়।"

ভারীগলায় আন্নাকালী বল্লিল, "তা হোক্। তাই ব'লে রাতদিন খেতে হবে নাকি। ····এত পাবে কোথায়?"

বিষাদের হাসি হাসিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন,"সেটা তুমি আমি যেমন বুঝি, ছেলেরা তেমন বুঝতে পারে না এই তো দুঃখ।"

আন্নাকালী নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাক্, রাধু গেল কোথায়?"

আন্নাকালী বলিল, "সতু কাঁদছিল, তাকে নিয়ে—"

—"ভিক্ষে করতে, না চুরি করতে?"

আন্নাকালী বলিল, "কি করতে তা রাধুই জানে।"

প্রিয়নাথ আবার ডাকিলেন, "ছোটবৌ!"

আন্নাকালী ফিরিয়া চাহিল।

প্রিয়নাথ স্বরে একটু রুষ্টতা আনিয়া বলিলেন, "তবুও আমাকে ওষুধ খাওয়াবে, কেমন?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আন্নাকালী বলিল, "অসুখ হ'লে সকলেই ওষুধ খায়।"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "রোগ হ'লে যারা ওষুধ খায় তাদের স্ত্রী-পুত্র নিশ্চয়ই না খেয়ে উপোস দিয়ে থাকে না।"

আন্নাকালী বলিল, "তারা আগে, না নিজের শরীর আগে? নিজে বাঁচলে তবে তো সব! নিজেই যদি মারা গেলে তাহ'লে তারা তোমার কি করবে আর তাদের দেখবেই-বা কে?"

—"দেখবেন ভগবান।"

—"হ্যাঁ, ভগবান দেখবার জন্যে ব'সে আছে।"

—"ভগবান্ ব'সে-ব'সেই উপায় করেন ছোটবৌ।"

শুনিয়া আন্নাকালী স্বামীর মুখের উপর উদাসদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

প্রিয়নাথ শান্ত-কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি বুঝছো না ছোটবৌ, আমি বেঁচে থাকতে তোমাদের দুঃখ-কষ্ট যাবে না। কিন্তু আমি ম'লে দেখবে, তখন বড়গিন্নী—যিনি এখন ফিরেও চেয়ে দেখেন না তিনি তোমাদের—"

আন্নাকালী তাড়াতাড়ি দুই হাতে স্বামীর মুখটা চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "দেখ, ফের যদি অমন কথা মুখে আনবে তাহ'লে তোমার পায়ে—"

কথা শেষ করিবার আগেই রুদ্ধকণ্ঠ মুক্ত হইয়া আন্নাকালীর দুই চোখে হু-হু করিয়া অশ্রুর প্লাবন আসিয়া প্রিয়নাথের বালিশ ভিজাইয়া দিল।

প্রিয়নাথ প্রীতিপ্রফুল্লদৃষ্টিতে স্ত্রীর সেই অশ্রুপ্লাবিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর আন্নাকালীকে মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া আঁচলে চোখ মুছিতে দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন, "এই তুচ্ছ কথায় তুমি একেবারে কেঁদে ফেললে ছোটবৌ!"

স্বামীর এই প্রীতিমধুর সম্ভাষণে আন্নাকালী আবার ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

প্রিয়নাথ হাত বাড়াইয়া স্ত্রীর একটা হাত ধরিলেন এবং সেই হাতখানা নিজের বুকের উপর রাখিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "ভয় নেই ছোটবৌ, মুখে বললেও সত্যি আমি এখন মরবো না; এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও ওষুধ খেয়ে আমায় বাঁচতে হবে। অন্তত তোমাকে ছেড়ে যেতে পারবো না বলেই আমাকে জোর ক'রে বেঁচে থাকতে হবে।"

আন্নাকালীর মাথাটা স্বামীর বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল।

ব্যাধিক্লিষ্ট বুকে স্ত্রীর মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া প্রিয়নাথ ভাবিলেন, কে বলে দুঃখে সুখ নাই...দারিদ্র্যে শান্তি নাই! যার নাই, তার ঘরে বোধহয় এমন গৃহলক্ষ্মীও নাই। কিন্তু হায়, এমন সজীব লক্ষ্মীপ্রতিমা থাকিতে আমি সোনার লক্ষ্মীর কৌটার লোভে গৃহলক্ষ্মীকে পথে বসাইলাম কেন!

প্রিয়নাথের রোগজীর্ণ বুকটাকে কাঁপাইয়া একটা অনুতাপের দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

এমন সময় পিছনের লঘু পদশব্দে চমকাইয়া মুখ ঘুরাইতেই আন্নাকালী দেখিল, শ্যামাসুন্দরী আসিতেছেন।

*

* *

ধীরে-ধীরে ঘরে ঢুকিয়া শ্যামাসুন্দরী ডাকিলেন, "ঠাকুরপো!"

চোখ বুজিয়াই প্রিয়নাথ উত্তর দিলেন, "কেন বৌঠান!"

—"নলিনের বিয়ে। নেমন্তন্ন করতে এসেছি!"

—"নেমন্তন্ন! আমাকে?"

—"হ্যাঁ। কি জানি, আজকাল নেমন্তন্ন না করলে তুমি যাবে কি না তা তো বলতে পারি না!"

—"তা যখন পারো না, তখন নেমন্তন্ন করলেই যে যাবো কি ক'রে বুঝলে?"

মৃদু হাসিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "সে তোমার খুশি। আমার ধর্ম্ম আমি ক'রে গেলাম, তোমার ধর্ম্ম তুমি করবে।"

প্রিয়নাথ উত্তর দিলেন, "ধর্ম্ম-কর্ম্ম আমার নেই বৌঠান!"

—"হয়তো নেই, কিন্তু চক্ষুলজ্জা তো আছে?"

—"চক্ষুলজ্জা থাকলে কি আর দাদার ছেলের সঙ্গে মকদ্দমা করতে পারতাম?"

অন্তর্নিহিত যাতনায় প্রিয়নাথের মুখের যা অবস্থা হইল শ্যামাসুন্দরী দেখিলেন, দেখিয়া অন্য কথা পাড়িলেন; বলিলেন, বিষয়-সম্পত্তি থাকলে অমন মামলা-মকদ্দমা অনেকেই ক'রে থাকে ঠাকুরপো, কিন্তু এমন ভাবে লুকিয়ে কেউ আত্মহত্যা করে না।"

প্রিয়নাথ নীরবে মুখ বিকৃত করিলেন।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "সত্যিই তোমার লজ্জা নেই ঠাকুরপো। লজ্জা থাকলে এমন শক্ত অসুখে তুমি মুখ গুঁজে চুপ ক'রে প'ড়ে থাকতে না, আর ঘটি-বাটি বেচেও তোমায় ওষুধ খেতে হতো না।"

ভ্রূকুটী করিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "অপরের দ্বারস্থ হওয়ার চেয়ে এটা লক্ষগুণে ভালো।"

তীব্রস্বরে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তা তুমি মনে করবে বৈকি। ···মনে কেন, একটু আগেই তা বললে, যে, তোমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম নেই। সে-কথাটা সত্যি! নইলে ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে যাকে ঘরে এনেছো, যার পেটের সন্তানদের না খেতে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুঁজে বিছানায় প'ড়ে আছো···· তোমার মনে এতটুকু ধর্ম্মজ্ঞান থাকলেও বুঝতে দেরী হতো না যে, কোনটা ভালো—অপরের দ্বারস্থ হয়ে এতগুলো প্রাণীকে রক্ষা করা, না নিজের জেদ বজায় রেখে তাদের মেরে ফেলা—"

প্রিয়নাথ একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি কি আজও আবার আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছো বৌঠান?"

দেবরের মুখের উপর তিরস্কারকঠিন-দৃষ্টিতে চাহিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তুমি ভুল বুঝেছো। এখন যা তোমার অবস্থা, তাতে অতি-বড় শত্রুও এসময় তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসবে না জেনে রাখো।"

প্রিয়নাথ পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

অসুস্থ দেবরকে আর ত্যক্ত করা উচিত নয় বুঝিয়া শ্যামাসুন্দরী আন্নাকালীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কি লো ছোটবৌ, তুইও কারুর দ্বারস্থ হবি না নাকি ?"

উত্তরে আন্নাকালী একটু ম্লানহাসি হাসিল।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তোরা যে যাবি না তা আমি জানি, তবু আমার মরণ, আমি না এসে থাকতে পারি না ....আচ্ছা ছোটবৌ, কি পুণ্য করলে তোদের মতন নিষ্ঠুর হওয়া যায় বল্ তো !"

মৃদুস্বরে আন্নাকালী বলিল, "সে খুব শক্ত তপস্যা....তুমি পারবে না দিদি !"

তর্জ্জন করিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "ঝাঁ্যাটা মারি অমন তপস্যার মুখে। তোদের তপস্যা নিয়ে তোরা থাক্, আমি সাত-জন্মেও এত নিষ্ঠুর হতে পারবো না।"

আন্নাকালী বলিল, "তা জানি।"

ঝঙ্কার দিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন,"জানতে আবার তোদের কিছু বাকি আছে নাকি ? কিন্তু তোদের এত অহঙ্কার কেন বল্ তো ? এদিকে খেতে অন্ন জোটে না...ঐ একটা লোক মরতে বসেছে, এত-বড় রোগে একটু ওষুধ পায় না....তবু অহঙ্কার তো তোদের কমে নি ?"

—"অহঙ্কার !" বলিয়া আন্নাকালী একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "অহঙ্কার নয় তো কি ? এমন

অসুখ, অথচ আমাকে একটা খবর দিস্ নি....দিলে কি তোর এতই অপমান হয়? এরপর মানুষটা বিঘোরে মারা গেলে তখন অহঙ্কার নিয়ে তুই করবি কি?"

আন্নাকালী শিহরিয়া উঠিল; শঙ্কিতস্বরে বলিল, "আমি কি করবো দিদি, আমার কি দোষ?"

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "করবি আমার শ্রাদ্ধ! কেন, করবার কি কিছুই নেই? আমরা কি এতই পর হয়ে গেছি যে, রেধোকে দিয়ে থালা-ঘটি বেচতে পাঠাচ্ছিস্ তবু আমার কাছে একবার পাঠাতে পারিস্ নি! দেখ্ ছোটবৌ, আজ তুই আমাকে ঠাকুরপোর খুব পর মনে করলেও, তুই আসবার আগে এমন একদিন ছিল যখন বৌঠান্ না হ'লে ওর এক দণ্ড চলতো না। আর আজ এমন ব্যায়রামে প'ড়ে—"

বাকি কথা মুখে আট্‌কাইয়া গেল। শ্যামাসুন্দরী ভীষণ রাগে ফুলিতে-ফুলিতে সহসা ওঁর চোখ দিয়া অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িল।

আন্নাকালী অবাকবিস্ময়ে দিদির অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

*

*   *

—"বৌঠান !"

আঁচলে চোখ মুছিতে-মুছিতে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "বলো।"

এপাশ ফিরিয়া শ্যামাসুন্দরীর মুখের দিকে সহাস্যদৃষ্টিতে চাহিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "আজ তুমি সত্যিই ঝগড়া করতে আসো নি।"

ভারীমুখে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তবে কিজন্যে এসেছি গণকঠাকুর !"

—"ঝগড়া-বিবাদ সব মেটাতে এসেছো।"

—"কথাটা মিথ্যে নয়; তোমাদের কষ্ট দেখে অনেক সময় সেইরকমই ইচ্ছে হয় বটে।"

মৃদু হাসিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "সে দয়ার পরিচয় সেদিন পেয়েছি বৌঠান, যেদিন তুমি 'রামদা' হাতে নিয়ে তোমায় খুন করতে হুকুম করেছিলে।"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "উপযুক্ত পাত্র দেখেই হুকুম করেছিলাম। অপাত্রে দয়া করলে সে অপঘাতের পাপটা নিজেকেই বইতে হতো।"

—"সেটা ঠিক" বলিয়া প্রিয়নাথ চোখ বুজিলেন।

শ্যামাসুন্দরী গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে ঝগড়া মেটাতে এসেছি তা তুমি কেমন ক'রে জানলে ?"

প্রিয়নাথ একটু হাসিলেন ; বলিলেন, "কে যেন আমায় ব'লে দিলে। ....একটা উদ্দেশ্য না নিয়ে যে হঠাৎ তুমি ছুটে এসেছো এ-কথা ভাবতে কে যেন আমায় নিষেধ করলে।"

শ্যামাসুন্দরী বললেন, "না। সে তোমায় ভুল বলেছে। আমি এসেছি নলিনের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে।"

—"আর সেইসঙ্গে নলিনের সম্পত্তিটা যাতে বজায় থাকে সে-চেষ্টা করতে।"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রিয়নাথের মুখের দিকে চাহিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "এ-কথার মানে? নলিনের সম্পত্তি তো বজায় আছে।"

—"সেটা বাইরে।"

—"আর ভেতরে?"

—"ভেতরটা হাতিতে-খাওয়া কয়েতবেলের মতন ফাঁপা!" শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "না, ফাঁপা নয়। যেটুকু আয় আছে, তাই নলিনের পক্ষে যথেষ্ট।"

—"নলিনের পক্ষে না হোক্, বৈদ্যনাথবাবুর পক্ষে বটে।" বলিয়া প্রিয়নাথ চোখ বুজিয়া পাশ ফিরিলেন।

শ্যামাসুন্দরী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নীরবে গম্ভীরমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন ঃ

...প্রিয়নাথের অনুমান মিথ্যা নয়। বৈদ্যনাথ বিষয়কর্ম্মে যতই সুনিপুণ হোন্, বিষয় রক্ষা করা তাঁর পক্ষে ক্রমেই দুরূহ হইয়া উঠিল। ব্যয়ের পরিমাণ যত বাড়িয়া গিয়াছে,

আয়ের পরিমাণ তার চেয়ে অনেক কম। তার ফলে ঋণের ভার দিন-দিন বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেই বর্দ্ধিত ঋণের দায়ে এক-একটি মহাল পরহস্তগত হইতেছে। বৈদ্যনাথ অনেক চেষ্টাতেও অপরের কবল হইতে সে-সব সম্পত্তি উদ্ধার করিতে পারিলেন না ; তাঁর সব চাতুর্য্য, সকল নৈপুণ্য একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল। নিজের এই লজ্জাকর ব্যর্থতায় বৈদ্যনাথ মরমে মরিয়া গেলেন।

কিন্তু দুষ্ট লোকের কথা স্বতন্ত্র। তারা বৈদ্যনাথবাবুর অক্ষমতার জন্য এই লজ্জাটাকে—চক্ষু-লজ্জারই নামান্তর বলিয়া মনে করিল এবং এই চক্ষুলজ্জার খাতিরেই যে তিনি বিক্রিত সম্পত্তিগুলাকে নিজের নামে খরিদ করিতে না পারিয়া বেনামীতে খরিদ কবিতেছেন, পরোক্ষে ইহা প্রকাশ করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না।

বৈদ্যনাথবাবু এবং তাঁর অনুগত কর্ম্মচারীরা এইসব লোককে নিন্দুক আখ্যা দিয়া ইহাদের কাছ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁর মধ্যেও কেউ কোনদিন তাঁর কাছে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে তিনি গম্ভীরহাসি হাসিয়া উত্তর দিতেন,স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন এইরকম নিন্দুকদের কলুষিত রসনা হইতে নিস্তার পান নাই তখন তিনি কোন্ ছার! সুতরাং এজন্য তাঁর ভীত বা চিন্তিত হইবার কারণ নাই। তাঁর ভয় বা চিন্তা শুধু ধর্ম্মের জন্য, ধর্ম্মের কাছে খাঁটি ; থাকিতে পারিলেই তিনি খালাস। যার যা ইচ্ছা হয় বলুক ;

কালে ধর্ম্মের বিজয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়া একদিন তাঁর এই মিথ্যা-কলঙ্ককালিমা চাপা দিয়া দিবেই।

অতঃপর বৈদ্যনাথ শুধু ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া ঋণজাল হইতে সম্পত্তি রক্ষার জন্য দান-ধ্যান পূজা-পার্ব্বণ প্রভৃতি বাজে খরচ কমাইয়া দিলেন। শ্যামাসুন্দরী ইহাতে আপত্তি করিলে, বৈদ্যনাথ ভগিনীকে বুঝাইয়া বলিলেন, "আগে বিষয়টা রক্ষা হোক্ শ্যামা ; একবার কতকগুলো ঋণ পরিষ্কার করতে পারলে তখন আবার যত ইচ্ছা দান-ধ্যান পূজা-অর্চ্চনা কোরো।"

সেদিন যে সুদূরপরাহত তা শ্যামাসুন্দরী বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাই অগ্রজের আশ্বাসে আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। তার উপর সম্পত্তিও যে দিনের পর দিন পরহস্তগত হইতেছে এ-সংবাদও নিত্য তাঁর কানে আসিত। এ-অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য তিনি অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না। নলিন আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত ; তাছাড়া সে ছেলেমানুষ, কিই-বা করিবে! ভরসা একমাত্র দাদা, কিন্তু তাঁর মেজাজও আর আগেকার মতন নাই ; কোন পরামর্শ করিতে গেলেই রাগিয়া ওঠেন। এমনকি, বৌদিদির প্রকৃতিও একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে! আগে যে এ-সংসারের তাঁর দাসীর মতন থাকিত, এখন সে যেন পুরা গৃহিণী হইয়া উঠিয়াছে। এখন সে নিজে হুকুম চালায়, কেউ একটা কথা বলিতে গেলে তাকে পাঁচটা কথা শুনাইয়া দেয়। সে যেন সংসারের কর্ত্রীর

দায়িত্বটা আস্তে-আস্তে শ্যামাসুন্দরীর হাত হইতে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টায় আছে।

দাদা-বৌদির এইসব ভাবভঙ্গী দেখিয়া শ্যামাসুন্দরী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং ভিতরে-ভিতরে একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে বুঝিতে তাঁর দেরী হইল না।

বুঝিলেন বটে, কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের প্রভাব কাটাইয়া কেমন করিয়া জমিদারী রক্ষা করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। স্ত্রীলোক তিনি, তাঁর শক্তি কতটুকু যে, বৈদ্যনাথের মতন ধুরন্ধর ব্যক্তিকে বুদ্ধির সংগ্রামে পরাজিত করিবেন? হায়, এ-সময়ে যদি ঠাকুরপো থাকিত!

শ্যামাসুন্দরী ঠাকুরঘরে মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা জানাইলেন, "হায় মালক্ষ্মী, তোমার জন্য যাকে কাঁদাইয়াছি, আজ তার শরণ লওয়া ভিন্ন তোমাকে ধরিয়া রাখিবার যে আর অন্য উপায় নাই!"

সম্পত্তির চিন্তায় প্রতি মুহূর্তে শ্যামাসুন্দরী যখন অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছেন এমন সময় বৈদ্যনাথবাবু হঠাৎ সতীর সঙ্গে নলিনের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন এবং বিবাহের দিন ঠিক করিয়া উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। এ-সময়ে নলিনের বিবাহ দিতে ইচ্ছা না থাকিলেও পুত্রের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া তাঁকে সম্মতি দিতে হইল; কিন্তু এ-বিবাহে যেরকম সমারোহ হওয়া উচিত তা হইল না। শ্যামাসুন্দরী এ-ব্যবস্থায় ক্ষুণ্ণ হইলেও বৈদ্যনাথ অবস্থা বুঝিয়াই ব্যবস্থা করিলেন।

সেদিন সারা রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় চিন্তা করিয়া শ্যামা-সুন্দরী এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন যে, এ-বিষয়ে একমাত্র প্রিয়নাথের পরামর্শ লওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, তাই নিমন্ত্রণের ছল করিয়া আজ দেবরের কাছে আসিয়া হাজির হইয়াছেন।

কিন্তু এখানে আসিয়া প্রিয়নাথের অবস্থা যা দেখিলেন তাতে শ্যামাসুন্দরীকে পরামর্শ গ্রহণের আশা ত্যাগ করিতে হইল। বুঝিলেন, বিপদ কখনও একা আসে না।

এখনও প্রিয়নাথকে ভিতরের সব কথা খুলিয়া বলিয়া, সাহায্য প্রার্থনা করিবেন কি না শ্যামাসুন্দরীর চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল। শুনিলে প্রিয়নাথ অবশ্য নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না, কিন্তু এই রুগ্ন-অবস্থায় দেবরকে কথাটা শুনাইয়া উদ্বিগ্ন করা সঙ্গত নয় বলিয়াই প্রিয়নাথ যখন দাদাকে ঈঙ্গিত করিয়া কথাটা বলিলেন তখন কি জবাব দিবেন তাই ভাবিতে লাগিলেন···

বৌঠানের চিন্তাভারাক্রান্ত মুখের দিকে চাহিয়া প্রিয়নাথ মৃদু আক্ষেপের স্বরে বলিলেন, "আমি সবই শুনেছি বৌঠান।"

তারপর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, "চুপ ক'রে রইলে যে, যা বলতে এসেছো, বলো ?"

গম্ভীরমুখে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "কি শুন্‌তে চাও তুমি ? নলিন সর্ব্বস্বান্ত হতে বসেছে আর তার প্রতিকারের জন্যে তোমায় অনুরোধ করতে এসেছি এই কথাটা আমার মুখে শুন্‌তে চাও ?"

প্রিয়নাথ মৃদু হাসিলেন; বলিলেন, "না। যা আমার শোনা আর জানা আছে সে-কথাটা নতুন ক'রে শোনবার কোন দরকার নেই।"

রুক্ষস্বরে শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "যার নিজের উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, তাকে আমি নতুন-পুরনো কোন কথাই শোনাতে চাই না!"

বলিয়া তিনি আন্নাকালীর হাত ধরিয়া টানিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

প্রিয়নাথ আবার পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

*

* *

—"এই সতী, দাঁড়া।"

জল-ভরা কলসী কাঁকালে লইয়া সতী....তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিতেছিল, পিছন হইতে আদেশের সুরে রাধু বলিয়া উঠিল, "এই সতী, দাঁড়া।"

বাধা পাইয়া সতী ঘাড় ফিরাইয়া রাধুকে দেখিয়া কাঁখের কলসীটা নামাইয়া দাঁড়াইল; বলিল, "এ-এ-এঃ, দাঁ-ড়া।....ওর হুকুম। কেন দাঁড়াবো বলো তো?"

একগাল হাসিয়া রাধু বলিল, "কি গাধা মেয়ে রে তুই—য়্যাঁ? আমার হুকুমে তো সেই দাঁড়ালি। আবার দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই বল্‌ছিস্‌, দাঁড়াবো কেন? ধ্যেৎ, বোকারাম!"

সতী বলিল, তোমার চেয়ে বোকা ? আমি কি পুরুষমানুষ যে 'রাম' হবো, 'গাধা' হবো ?"

খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতে-হাসিতে রাধু বলিল, "ও, ঠিক ঠিক ! তোকে 'রামি' কিম্বা 'গাধি' বললেই ঠিক হতো—না ? বেশ, তাই বলবো। দেখ্ গাধি ! ....আচ্ছা, গাধির চেয়ে তুই 'রাধি' হ' না কেন ? আমি রাধু আর তুই রাধি ! বেশ মানাবে—কেমন ?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া সতী বলিল, "হ্যাঁ-য়্যাঁ-য়্যাঁ....মা-না-চ্ছে ! বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা ! ওর সঙ্গে যেন আমার বিয়ে হচ্ছে ! সে গুড়ে বালি !"

—"আচ্ছা, বালী কি বনমালী সে পরে বুঝবি। কিন্তু এখন থেকে যে একেবারে গরম হয়ে উঠলি ! তবু এখনো বড়লোকের সঙ্গে বিয়ে হয় নি।"

কোমরে হাত দিয়া তির্য্যকভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রাধুর দিকে বাঁকা চোখে চাহিয়া সতী বলিল, "হয় নি, হবে তো ?"

হাসিতে-হাসিতে রাধু বলিল, "হবে যে তাই-বা কে বল্‌তে পারে ?"

সতী বলিল, "তুমি ছাড়া আর সব্বাই বল্‌তে পারে।"

—"সবার কথা বাদ দে। আমি বলছি হতে পারে না।"

—"হোক্ না হোক্, তোমার এত মধ্যস্থি কেন বলো তো ?"

—"আমার যে তাতে লাভ আছে।"

—"ই-ইঃ, লাভ আছে। কি আমার লাভ-ওলা গো! লাভটা কি, শুনি?"

লাভটা যে কি রাধু তা বলিল না, শুধু মুখ টিপিয়া একটু হাসল।

ওকে হাসিতে দেখিয়া সতী তর্জ্জনী তুলিয়া বলিল, "যার সাহস আছে সে মুখের সামনে বলবে। ....ভীতু কোথাকার!"

রাধু বলিল, "আমি বলবো না, কি করবি আমার?"

—"না বললে তো বোয়েই গেল।" বলিয়া হাত নাড়িয়া সতী মুখ ফিরাইয়া লইল।

সতী যাতে শুনিতে পায় এই ভাবে রাধু দুষ্টামি-ভরা উচ্চ হাসি হাসতে লাগিল।

সতী মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তাহ'লে আমি যাচ্ছি।"

সহাস্যে রাধু বলিল, "যা না, কে তোকে ধ'রে রেখেছে?"

'যাচ্ছি' বলিয়াও সতী গেল না; তেমনি দাঁড়াইয়া কলসীর গায়ে হাতের চুড়িটা ঠুকিতে লাগিল।

রাধু কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, সতি?"

—"কী?"

—"তোর কি হয়েছে?"

—"কী আবার হবে!"

—"তবে আমার সঙ্গে আর আগের মতন ভালো ক'রে কথা কোস্ না কেন?"

—"কথা কইলেই তো খালি বিয়ের কথা!"

—"আরে পাগলি, বিয়ের চেয়ে মিষ্টি-কথা আর কিছু আছে নাকি?"

ঝঙ্কার দিয়া সতী বলিল, "সে যাদের বিয়ে হয়েছে তারা জানে। ...আমি জানি?"

বিজ্ঞের মতন রাধু বলিল, "জানিস্ না বলেই তো বলছি, চট্‌পট্ আমায় বিয়ে ক'রে ফ্যাল্!"

—"আহা-হা, বিয়ে ক'রে ফ্যাল্! বিয়ে করাটা যেন আমার হাত।"

ওর মনের গোপন-কথা বাহির করিয়া ফেলার আনন্দে রাধু ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "না, তাতে তোর হাত নেই বটে, লোকে বলে সেটা ভগবানের হাত। সে-কথা সত্যি। তবে তুই এক কাজ কর্। রোজ ভগবানের কাছে মানত কর্, 'হে ভগবান্! রাধুদা যেন আমার বর হয়'— কেমন্, পারবি না?"

সতী আনমনে বলিয়া ফেলিল, "করি তো।" বলিয়া তখনি কি মনে পড়িতেই জিভ কাটিয়া বলিল, "ছি-ছি তাও আবার হয় নাকী? দাদা কখনো বর হতে পারে?"

উত্তরে রাধু বলিল, "না, হয় না আবার। সেই যে সেই তোকে রথতলায় রথ দেখাতে নিয়ে গেছলাম, রথের উপর দু'পাশে দুই দাদা জগন্নাথ আর বলরাম, আর মাঝখানে তাদের বোন্ সুভদ্রা ব'সে আছে—সেই যে রে! তোর মনে

পড়ছে না ? চলতে-চলতে হঠাৎ রথটা রাস্তায় আট্‌কে গেল, আর চলে না দেখে পাণ্ডারা 'বোন-মেগো' 'বোন-মেগো' ব'লে বেত মারতেই ঘড়ঘড় ক'রে রথ আবার চলতে লাগলো—সেই যে সেই ?"

এতক্ষণে সতীর মনে পড়িল—হ্যাঁ, রাধুদা ঠিকই বলিয়াছে বটে। রথের উপর জগন্নাথ-বলরামের মাঝখানে বোন্ সুভদ্রা তো ঠায় বসিয়াই ছিল, আর রথ চলিতে-চলিতে হঠাৎ আট্‌কাইয়া যাইতেই সেই 'বোন্-মেগো' বলিয়া যেমনি বেত—

সতী হাসি চাপিতে না পারিয়া আর এ-কথার উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "দূ—র !"

রাধু বলিল, "তা, দূর হয়ে নাহয় যাচ্ছি, কিন্তু ভারী আরাম লাগছে আমার, জানলি সতী, তুই যে ভগবানের কাছে আমায় পাবার জন্যে—"

—"ঈ-ই-ই-স্ ! ওকে পাবার জন্যে। আমি রোজ ভগবানকে ডাকি, হে ভগবান্ ! আমায় এমন একটা বড়লোকের ছেলের বউ ক'রে দাও, যাতে আমি গা-ভর্ত্তি গয়না পরতে পাই.... ভাতের পাতে রোজ মাছের মুড়ো খেতে পাই..."

সতীর কথা শুনিয়া রাধুর মুখ একেবারে কালো হইয়া গেল।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সতী ত্রস্তে কলসীটা কাঁখে তুলিয়া লইয়া চঞ্চলা হরিণীর মতন দ্রুতপদক্ষেপে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

ওর গমন-পথের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবার সময় রাধুর বুকের ভিতর হইতে যে একটা উষ্ণ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া গেল তার অনুভূতি ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরের হইবে না।

পৃথিবী সৃষ্টির আদিমকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এই যুগযুগান্তরের ব্যবধানের মধ্যে প্রকৃতির লীলাভূমির শ্যামাঞ্চলে পল্লীজননীর কোলে লালিত উদ্ভিন্ন-যৌবন কিশোর-কিশোরীর এই প্রথম অনুরাগের কাহিনী শুধু স্রষ্টা আর ভাবুক কবি ভিন্ন অন্যে অনুধাবন করিতে পারে না। শহরের পালিশ-করা কথার ছলনায় মুগ্ধ লুব্ধ বিলাস-প্রয়াসীদের সঙ্গে এ-পূর্ব্বরাগের কোথাও মিল নাই। না থাকিলেও, অন্য জাতির নকল করিয়া সকল হারাইবার অনুতাপ ইতিমধ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে। আমাদের ভবিষ্যৎ আশা উত্তরপুরুষদের উজ্জ্বল-জীবনে আবার এমন সংস্কৃতি আসিবে যখন আমরা আমাদের হারানো সব-কিছু আবার ফিরিয়া পাইব। সে দিন আগতপ্রায়।

*

*　　*

শ্যামাসুন্দরী চলিয়া যাইবার পর প্রিয়নাথ কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিলেন। ঘুম আর চোখে আসে না। স্মৃতির খাতার পাতা উল্টাইয়া অতীত আভিজাতের গৌরবময় কাহিনীর নানা কথা ভাবিতে-ভাবিতে মনে হইতে লাগিল,

যে-সব যেন রূপকথার অবাস্তব গল্প…বর্ত্তমানের সঙ্গে তার কিছুই মিল নাই। সেই মুখর অতীত আজ একেবারে মূক হইয়া গেছে। হোক্ গল্প, হোক্ স্বপ্ন, এরকম স্বপ্ন দেখিয়াও সুখ আছে। কিন্তু হায়! 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়'।…এইসব চিন্তার মায়াজালে জড়াইয়া কোন্ এক অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে প্রিয়নাথ ঘুমের অতলে তলাইয়া একেবারে স্বপ্নরাজ্যে যেখানে হাজির হইলেন সেখানে সুখ-দুঃখ অতিমাত্রায় আত্ম-প্রকাশ করে। কিন্তু ওঁর অদৃষ্টে সুখ কোথায়? প্রিয়নাথ দেখিলেন, ওঁর চোখের সামনে এক চতুর্ভুজা পদ্মহস্তা জ্যোতির্ম্ময়ী সচল-প্রতিমা আসিয়া ধীরে-ধীরে দাঁড়াইলেন। সে অপরূপ রূপলাবণ্যময়ীর দিকে সহসা চাহিয়াই ভয়ে ও বিস্ময়ে প্রিয়নাথের চেতনা লুপ্ত হইল।

বীণার সুরে দেবী ডাকিলেন, "প্রিয়নাথ!"

শঙ্কাজড়িতস্বরে প্রিয়নাথ উত্তর দিলেন, "কে তুমি মা?"

—"আমাকে চিন্‌তে পারছো না?"

—"চিনেছি মা। তুমি তো আমাদের কুললক্ষ্মী?"

—"হ্যাঁ। আমিই লক্ষ্মী। আমার আশীর্ব্বাদেই মল্লিক-বংশের এত প্রতিপত্তি হয়েছিল।"

প্রিয়নাথের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। দেবী তখন তাঁর কৌষেয়-বসনাঞ্চল হইতে প্রিয়নাথের অতি পরিচিত ও আকাঙ্ক্ষিত সিঁদুর-মাখানো একটি সোনার কৌটা বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কি বলো দেখি?"

বিস্ময়বিহ্বলকণ্ঠে প্রিয়নাথ বলিলেন, "লক্ষ্মীর কৌটা"

—"তুমি নেবে ? "

"এখন আর ওকে নিয়ে কি করবো মা ?"

—"ঘরে তুলে রাখবে। এ যে আমার অধিষ্ঠানভূমি—লক্ষ্মীর-কৌটা। এই কৌটাই তো তুমি চেয়েছিলে।"

—"চেয়েছিলাম, যখন তুমি ওতে ছিলে। কিন্তু আজ যে ও অন্তঃসার শূন্য মা !"

—"সে তো তুমিই করেছো।"

—"ভুল করেছি মা।"

দেবী একটু হাসিলেন। সেইটুকু হাসিতেই শতবিদ্যুৎ একসঙ্গে প্রস্ফুরিত হইল।

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহ'লে এ কৌটা তুমি নেবে না ?"

মোহের ঘোরে প্রিয়নাথ বললেন, "না। ও কৌটা যেখানে ছিল সেখানেই থাক্।"

—"তাতে তোমার লাভ ?"

—"লাভ, মল্লিকবংশের গৌরব তবু কোনরকমে রক্ষা পাবে !"

—"তুমি সত্যই উদার।"

—"না মা, আমি নির্ব্বোধ।"

—"নির্ব্বোধ হলেও এ-বংশের গৌরব রক্ষা করতে একমাত্র তুমিই পারো।"

বিষাদগম্ভীরকণ্ঠে প্রিয়নাথ বলিলেন, "কিন্তু মা, আমি যে এখন নিরুপায়!"

মধুর সান্ত্বনার স্বরে দেবী বললেন, "না, এখনো উপায় আছে। তুমি এই কৌটা নাও আর লক্ষ্মীরূপিণী পুত্রবধূকে ঘরে নিয়ে এসো।"

বিস্ময়পূর্ণকণ্ঠে প্রিয়নাথ বললেন, "পুত্রবধূ! আমার আবার পুত্রবধূ কে মা?"

—"সতী।"

—"নলিনের সঙ্গে তো তার বিবাহ হচ্ছে!"

—"না, এখনো হয় নি। তুমি রাধুর সঙ্গে তার বিবাহ দাও।"

—"কেমন ক'রে আর তা সম্ভব হবে মা! আজ আমার খাবার সংস্থান নাই জেনেও আমার ছেলেকে তারা মেয়ে দেবে কেন?"

—"তুমি একবার বল্‌লেই দেবে।"

—"তা আমি পারবো না।"

—"তবে তোমার বংশের লুপ্তগৌরবও আর ফিরে পাবে না। এই বিবাহের সঙ্গেই সব শেষ হয়ে যাবে!"

কৌতূহলমিশ্রিতকণ্ঠে প্রিয়নাথ বলিয়া উঠিলেন, "সব শেষ হয়ে যাবে?"

মেঘগম্ভীরকণ্ঠে দেবী বলিলেন, "হ্যাঁ, সব শেষ হয়ে যাবে। সামনের ঐ পটভূমিকার দিকে চেয়ে দেখ........"

....ওঃ, কি ভীষণ দৃশ্য! মল্লিকদের প্রকাণ্ড অট্টালিকার এক-একখানি ইট খসিয়া পড়িতে-পড়িতে নিমেষে ঐ বিশালকায় অট্টালিকার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিল যে! প্রাসাদের পরিবর্ত্তে দেখা হয়ে বৃক্ষাবলীবেষ্টিত একটা ভগ্নস্তূপ, আর সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে একখানি ঘর শুধু কোনরকমে আপনাকে খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! ওটা ঠাকুরঘর না? কিন্তু ঠাকুরঘরে ঠাকুর কৈ? সে বিগ্রহ নাই, শিলামূর্ত্তি নাই, বিগ্রহের সিংহাসনখানি পর্য্যন্ত নাই; শুধু একপাশে কুলঙ্গীর উপর একটি সিঁদুর-মাখানো সোনার কৌটা মাকড়সার জালে অস্পষ্ট হইয়া অনাদৃত ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। ওই না সেই লক্ষ্মীর কৌটা?

প্রিয়নাথ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে চোখ বুজিলেন।

কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলিতেই চোখের সামনে আবার সহসা একউজ্জ্বল দৃশ্য দেখিয়া অনিমেষ দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন।

আশ্চর্য্য! সেই ভগ্নস্তূপের এক-একখানি ইট সাজাইয়া সেখানে কে আবার এক মনোরম সৌধের পত্তন করিয়াছে! কি বিশাল, কি মনোহর সৌধ! কে সে ভাগ্যবান্ পুরুষ, যে ভগ্নস্তূপের কঠোর স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়া সেখানে এত শীঘ্র এমন অপূর্ব্ব সৌধ রচনা করিল! আর সৌধ-শিরে গর্ব্বোন্মত্ত বুকে দাঁড়াইয়া ও কে! বৈদ্যনাথ না? হ্যাঁ, বৈদ্যনাথই তো। আর নীচে দ্বার-প্রান্তে উহারা কারা? অস্থিচর্ম্মসার দীনহীন মলিনবেশে নলিন

আর তার পাশে দাঁড়াইয়া রুক্ষকুন্তলা চীর-বসনা শ্যামাসুন্দরী কৃতাঞ্জলীরপুটে গৃহস্বামীর দয়া প্রার্থনা করিতেছে····

প্রিয়নাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "মা! মা"

—কোথায় মা? মা তখন তাঁর সান্নিধ্য হইতে বহু-দূরে এক হাতে প্রস্ফুটিত কমল, অপর হাতে সেই কৌটা লইয়া, শ্যামাসুন্দরী আর নলীনের দিকে বিষাদের দৃষ্টিতে চাহিতে-চাহিতে নবনির্ম্মিত অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশোদ্যত হইয়াছেন!

প্রিয়নাথ আকুলকণ্ঠে আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "মা মা! ফিরে এসো····ফিরে এসো········"

নিদ্রাদেবী এবার মায়াকাঠি সরাইয়া লইলেন। দুর্ব্বল প্রিয়নাথ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া শয্যায় বসিয়া কাঁপিতে লাগিলেন ওঁর সর্ব্বাঙ্গে ঘাম দেখা দিল।

আন্নাকালী ঘরে ঢুকিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো, কি হলো? হঠাৎ অমন চেঁচিয়ে উঠলে কেন? কি হয়েছে?"

কপালের ঘাম মুছিতে-মুছিতে ভীতিরুদ্ধকণ্ঠে প্রিয়নাথ উত্তর করিলেন, "কিছু না; ও একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।"

বলিয়া প্রিয়নাথ সভয়ে চারিদিকে চঞ্চলদৃষ্টিতে চাহিলেন। স্বপ্নটা তখনও যেন সত্য বলিয়া মনে হইতেছিল; দেবীর অঙ্গসৌরভ তখনও যেন ঘরের মধ্যে বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইতেছে····তাঁর বীণা-বিনিন্দিত স্বরলহরী তখনও যেন থাকিয়া-থাকিয়া ওঁর শ্রুতিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে···

মোহাবিষ্টের মতন প্রিয়নাথ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

আন্নাকালী জিজ্ঞাসা করিল, "কি স্বপ্ন দেখছিলে গা!"

প্রিয়নাথ সে জিজ্ঞাসার কোন উত্তর দিলেন না; আস্তে-আস্তে বিছানা হইতে নামিয়া কম্পিত-পায়ে দরজার দিকে চলিতে সুরু করিলেন।

আন্নাকালী ব্যস্ত ভাবে আসিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছো?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "ছেড়ে দাও ছোটবৌ, বাইরে এখন আমাকে একবার যেতেই হবে।"

আন্নাকালী বলিল, "সে কি গো! তোমার দাঁড়াবার শক্তি নেই, তুমি বাইরে যাবে কি?"

ব্যগ্রস্বরে প্রিয়নাথ বলিলেন, "শক্তি না থাকলেও আমাকে জোর ক'রে যেতে হবে।...মল্লিকবংশের লক্ষ্মী চলে যাচ্ছে, আমি ছাড়া মাকে ধ'রে রাখবার শক্তি আব কারুর নেই।"

স্বামীর হেঁয়ালির কথা বুঝিতে না পারিয়া আন্নাকালী কি করিবে ভাবিতেছে...সেই অবসরে দরজার পাশের লাঠিটা কম্পিত-হাতে লইয়া প্রিয়নাথ আবার ধীরে-ধীরে চলিতে সুরু কয়িয়াছেন...এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, "ছোটবাবু বাড়ীতে আছেন?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "কে?"

—"আমি রমেশ চৌধুরী।"

বলিয়া রমেশবাবু বাড়ীতে ঢুকিয়াই প্রিয়নাথকে লক্ষ্য

করিয়া বলিলেন, "মেয়েদের একটু সরে যেতে বলুন ছোটবাবু ; আপনার অস্থাবর সম্পত্তিতে ক্রোক দেওয়া হবে।"

তাঁর কথা শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে আদালতের পেয়াদা আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল।

প্রিয়নাথ কাঁপিতে-কাঁপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

রমেশ ডাকিলেন, "ছোটবাবু !"

বিবর্ণমুখে প্রিয়নাথ তাঁর দিকে চাহিলেন।

রমেশ বলিলেন, "আমার কোন অপরাধ নেই ছোটবাবু।"

ক্ষোভরুদ্ধকণ্ঠে প্রিয়নাথ বলিলেন, "আপনি জামায়ের হুকুম তামিল করতে এসেছেন, আপনার আর অপরাধ কি ?"

রমেশ বলিলেন, "না ছোটবাবু, আমি জামায়ের হুকুম তামিল করতে আসি নি ; আমি এসেছি, মনিবের হুকুম তামিল করতে।"

—"কে আপনার মনিব ! ....বদ্যিনাথবাবু ?"

—"না, নলিনবাবু।"

—"বেশ, আপনি হুকুম তামিল করতে পারেন।"

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রিয়নাথ মাথা নীচু করিলেন।

রমেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে-ধীরে ডাকিলেন, "ছোটবাবু !"

মুখ না তুলিয়াই প্রিয়নাথ উত্তর দিলেন, "শুনেছি, বলুন না !"

—"আপনি কি একবার বৈদ্যনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারেন না ?"

—"না।"

—"কিন্তু দেখা করলে বোধহয় ভালো হতো।"

দাঁতে দাঁত চাপিয়া প্রিয়নাথ উত্তর করিলেন, "আমার ভালো-মন্দ আমি বুঝবো,আপনি যা করতে এসেছেন করুন।"

অগত্যা রমেশ পেয়াদাকে ইঙ্গিত করিলেন। পেয়াদা লোকজন লইয়া ঘরের বাক্স-পেঁট্‌রা ঘটি-বাটি সব বাহির করিয়া উঠানে ফেলিতে লাগিল…

মুহূর্ত্তে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, প্রিয়নাথের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হইতেছে ! গ্রামের বিস্তর লোক পরম কৌতূহলে কৌতুক দেখিতে ছুটিয়া আসিল। তাদের মধ্যে কেউ-বা ছোট-বাবুর এই বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে, আর কেউ-কেউ ওঁর নির্ব্বুদ্ধিতার উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। যারা বরাবর ছোটবাবুর ভয়ে তটস্থ থাকিত—সুযোগ বুঝিয়া তারাও দুই-একটা বিদ্রূপবাণ প্রয়োগ করিতে ছাড়িল না।

প্রিয়নাথ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। নীরবে কাঠের পুতুলের মতন আড়ষ্ট ভাবে বসিয়া তাদের এইসব তীব্র-কোমল সমালোচনা শুনিতে লাগিলেন।

সহসা সেই জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল এবং 'মামাবাবু আসছেন, মামাবাবু আসছেন' বলিয়া সকলে সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল।

দেখিতে-দেখিতে জনতা ভেদ করিয়া বৈদ্যনাথবাবু হাঁপাইতে-হাঁপাইতে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং আসিয়াই রমেশ চৌধুরীর দিকে তিরস্কারের দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "এসব কি রমেশবাবু ?"

নতমুখে অপ্রতিভ রমেশ বলিলেন, "নলিনবাবুর হুকুম।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "নলিন এখনও ছেলেমানুষ, কিন্তু তুমি তো ছেলেমানুষ নও ?"

রমেশ লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

বৈদ্যনাথ এবার পেয়াদার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ডিক্রীর সমস্ত টাকা আমি আমার স্ত্রীর অলঙ্কারপত্র বেচে মিটিয়ে দেবো, তোমরা এখন যেখানকার জিনিস সেইখানে তুলে রাখো।"

সকলে বৈদ্যনাথবাবুর জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল; কিন্তু প্রিয়নাথের মৌনভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। উনি যেমন মাথা নীচু করিয়া বসিয়াছিলেন তেমনি বসিয়া রহিলেন।

বৈদ্যনাথ ছোটবাবুর সামনে দাঁড়াইয়া সান্ত্বনার সুরে বলিলেন, "কিছু মনে করবেন না ছোটবাবু, আমায় না জানিয়েই এরা এই কাজ করেছে। ছি ছি, আমাদের আমলাগুলোর কি একটু চোখের চামড়া নেই ?"

বলিয়া উনি রমেশের দিকে কঠোরদৃষ্টিতে চাহিলেন।

পেয়াদার লোকেরা রমেশবাবুর হুকুমে যেমন ঘরের

জিনিসপত্র বাহির করিয়াছিলেন, বৈদ্যনাথবাবুর আদেশে তেমনি আবার সেইসব জিনিস বাহির হইতে ঘরে তুলিতে লাগিল…

বৈদ্যনাথ বলিতে লাগিলেন, "মানুষের দশ দশা, কখন হাতি, কখন মশা। কার ভাগ্যে কখন্ কি আছে বলা যায় না, অথচ জেনে-শুনেও মানুষ মানুষের ওপর অত্যাচার করতে ছাড়ে না। …ছিঃ!"

চারিদিক হইতে প্রশংসমান দৃষ্টি আসিয়া বৈদ্যনাথের মুখের উপর পড়িল। প্রিয়নাথও বিস্ময়বিস্ফারিতদৃষ্টিতে বৈদ্যনাথের মুখের দিকে চাহিলেন। বৈদ্যনাথের এই অসাময়িক উদারতা ওঁর কাছে খুব আশ্চর্য্য বোধ হইল। যে বৈদ্যনাথবাবু ওঁকে একদিন পথে বসাইতে কুণ্ঠিত হন নাই, আজ তার এই উদারতার ভান, দরিদ্রের প্রতি ধনীর অনুকম্পা ছাড়া যে আর কিছু নয় এবার উনি স্পষ্ট বুঝিলেন; বুঝিয়া নিজের দৈন্য স্মরণে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন! হায়, যে বৈদ্যনাথ একদিন ওঁর দয়ার প্রত্যাশী ছিল, সে আজ ওঁকে দয়া দেখাইতে আসিয়াছে! এই দয়াটা নিষ্ঠুর পরিহাস বুঝিয়া এটা স্বীকার করিয়া লইতে প্রিয়নাথের অন্তর লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া আসিল।

ওঁর এই সঙ্কোচ ভাবটা চতুর বৈদ্যনাথের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিল না তাই কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য ব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আপনার এতে খুবই দুঃখ হতে পারে, কিন্তু ছেলেমানুষের অপরাধ আপনাকে মার্জ্জনা করতেই হবে ছোটবাবু। নলিনের হয়ে আমি আপনার কাছে মাপ চাইছি।"

এতটা বিনয়ের উত্তরে প্রিয়নাথ আর কিছু বলিতে না পারিয়া ভদ্রতার খাতিরে বৈদ্যনাথকে ধন্যবাদ দিলেন।

বৈদ্যনাথ লজ্জিত-বিনয়ে যথেষ্ট সৌজন্য প্রকাশ করিয়া প্রিয়নাথকে আপ্যায়িত করিয়া তখনকার মতন বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বৈদ্যনাথ চলিয়া যাইবার সঙ্গে-সঙ্গে সমাগত গ্রামবাসী কেউ প্রফুল্ল মনে, কেউ-বা দুঃখ করিতে-করিতে একে-একে চলিয়া গেল।

সকলে চলিয়া গেলেও রমেশবাবু গেলেন না। তিনি কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীর-গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন, "ছোটবাবু!"

প্রিয়নাথ মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

রমেশবাবু বলিলেন, "মনে পড়ে কি, আপনি একদিন আমার অস্থাবর সম্পত্তিতে ক্রোক দিতে গিয়েছিলেন?"

ম্লান হাসিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "ও, তাই বুঝি আজ আপনি তার শোধ নিতে এসেছিলেন?"

তীব্রকণ্ঠে রমেশবাবু বলিলেন, হ্যাঁ। কিন্তু বৈদ্যনাথবাবুর দয়ায় এ-যাত্রা আপনি বেঁচে গেলেন।"

বলিয়াই তিনি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

প্রিয়নাথ জড়ের মতন অবিচল বসিয়া রহিলেন। ...হায়! কাকে রক্ষা করিবার জন্য এই জীর্ণ অপটু শরীর লইয়া আজ তিনি যাইতেছিলেন? যাকে রক্ষা করিতে যাইতেছিলেন তিনি

অনেক আগেই চলিয়া গিয়াছেন! না গেলেও তাঁকে আগলাইবার আর প্রয়োজন কি? যেজন্য প্রয়োজন তা তো চুকিয়া গিয়াছে। মান-সম্ভ্রম যখন লোপ পাইল তখন লক্ষ্মীকে আগলাইয়া কি হইবে? শূন্যতোয়া তটিনীর ভাঙা-বাঁধে মাটি দিয়া লাভ কি?

প্রিয়নাথের পাঁজরার হাড়গুলাকে দুমড়াইয়া দিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া গেল। আস্তে-আস্তে উঠিয়া ঘরে গিয়া উনি আবার শয্যার আশ্রয় লইলেন।

*

*   *

আন্নাকালী ঘরে ঢুকিয়া স্বামীর মাথার কাছে বসিয়া নিঃশব্দে ধীরে-ধীরে বাতাস করিতে লাগিল….নিমীলিতচোখে প্রিয়নাথ পড়িয়া রহিলেন।

হঠাৎ একসময় চোখ মেলিয়া প্রিয়নাথ ডাকিলেন, "ছোটবৌ!"

ব্যস্ত হইয়া আন্নাকালী বলিল, "এই যে আমি তোমার কাছেই ব'সে আছি।"

একটু থামিয়া একটা ঢোক গিলিয়া প্রিয়নাথ অতি কষ্টে বলিলেন, "মালক্ষ্মী সত্যিই চলে গেলেন ছোটবৌ।"

—"কোথায় গেলেন?"

—"বদ্যিনাথবাবুর ঘরে।"

—"কিসে বুঝলে গা?"

—"দেখলে না, আজ তিনি কেমন আমার মান-ইজ্জৎ বাঁচিয়ে গেলেন!"

—"মানুষ যে, সে মানুষের বিপদে এইরকম উপকারই ক'রে থাকে।"

—"আর যে মানুষ তা করতে পারে, মালক্ষ্মী তাকে কৃপা না ক'রে থাকতে পারেন না। বুঝে দেখ, শত্রু কি সহজে শত্রুর উপকার করে?"

—"বষ্ঠিনাথবাবু কি তোমার শত্রু?"

—"পরম শত্রু। সুযোগ পেলে আজও আমি তার অনিষ্ট না ক'রে ছাড়ি না।"

আন্নাকালী মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

সেদিকে চাহিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "হাসলে যে বড়ো?"

আন্নাকালী বলিল, "তোমার কথা শুনে। শত্রুরও তুমি উপকার ছাড়া কখনো অপকার করো নি, আর যে তোমার মান-ইজ্জৎ বাঁচিয়ে গেল তার অনিষ্ট করবে?"

—"করতে পারি না?"

—"পারো কি না তা কি আজও আমার জানতে বাকি আছে?"

প্রিয়নাথও এবার একটু হাসিলেন; বলিলেন, "তা বটে। কিন্তু শুধু তুমি নও, আরও একজন জানে।"

—"কে?"

—"ঐ বষ্ঠিনাথবাবু।"

আন্নাকালী অবাকবিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।

প্রিয়নাথ বলিলেন,"তিনি জানেন বলেই আজ আমার এই উপকারটুকুর অছিলায় আমার হাত-পা বেঁধে রেখে গেলেন।"

আন্নাকালী বলিল, "সে আবার কি গো ?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "তুমি বুঝতে পারছো না ? বস্তিনাথবাবু এরপর যদি টেনে-হিঁচড়ে নলিনের কাছ থেকে মালক্ষ্মীকে কেড়ে নিয়ে যায়, তাহ'লেও আমি শুধু ব'সে-ব'সে দেখবো, তাঁর বিরুদ্ধে একটি আঙুলও তুলতে পারবো না।"

কথাটা বুঝিয়া লইয়া আন্নাকালী ম্লানস্বরে উত্তর করিল, "ও, তা বটে। এবার বুঝেছি।"

প্রিয়নাথ বলিলেন,"তিনি বেশ জানেন,প্রিয় মল্লিক দাঁড়িয়ে থেকে লোকের ঘর জ্বালিয়ে দিতে পারে, কিন্তু অকৃতজ্ঞ হতে পারে না। তাই তিনি সাপ হয়ে কামড়ে, ওঝা হয়ে বিষ ঝেড়ে গেলেন। মানে,ভেতরে-ভেতরে ক্রোকের বন্দোবস্ত ক'রে, শেষে বাইরে সাধু সেজে আমার মান-ইজ্জৎ বাঁচিয়ে গেলেন !"

আন্নাকালী এ-কথার প্রতিবাদ করিল ; বলিল, "না না, তাও কি কখনো হতে পারে ?"

সহাস্যে প্রিয়নাথ বলিলেন, "পারে গো, পারে। আমি জমিদারের ছেলে, এতকাল জমিদারী চালিয়ে এসেছি, এসব চালবাজি ধরতে আমার দেরী হয় না।"

একটু ভাবিয়া আন্নাকালী বলিল,"তা, হ্যাঁগ্যা। তুমি যখন তার চালাকি ধরেছো, তখন তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দোষ কি ?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "ধর্ম্মত কোন দোষ না থাকলেও, লোক-সমাজে একটু দোষ আছে বৈকি। লোকে বলবে, প্রিয় মল্লিক নিতান্ত অকৃতজ্ঞ।"

আন্নাকালীও তা বুঝিল, বুঝিয়া নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

প্রিয়নাথ একটা সজোর নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার চোখ বুজিলেন।

এমন সময় রাধু ব্যস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া উৎসাহপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "একটা চাকরির যোগাড় ক'রে এলাম মা। সাত টাকা মাইনে, তাছাড়া খেতে দেবে। কাজ এমন-কিছু শক্ত নয়, শুধু দোকানে ব'সে বেচাকেনা করতে হবে।"

শুনিয়া আন্নাকালী মোটেই খুশী হইল না; শুধু কাতরদৃষ্টিতে একবার ছেলের মুখের দিকে চাহিল।

প্রিয়নাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

*

* *

প্রিয়নাথের স্বপ্ন নিষ্ফল হইল না; দুই-চারিদিন পরেই শোনা গেল, আমলাপুরের সদর কাছারী হইতে প্রেরিত বারো হাজার টাকা রাস্তায় লুট হইয়া গিয়াছে! যে পশ্চিমা-দরোয়ান চালান আনিতেছিল সে জখম হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে… গোমস্তা পালাইয়া কোনরকমে প্রাণ বাঁচাইয়াছে! এদিকে সামনে লাটের কিস্তী। বৈদ্যনাথ কিস্তীর টাকা সংগ্রহের জন্য

প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, সোনা-রূপার গহণাপত্র পর্য্যন্ত বিক্রয় আর বন্ধক দেওয়া হইতেছে, তবু কিস্তীর টাকা যোগাড় হইতেছে না। সকলেই আশঙ্কা করিতেছে, মল্লিকদের জমিদারী এবার নিলামে উঠিবে এবং সম্ভবত সিংপুরের ঘোষবাবুরা নিলাম ডাকিয়া লইবেন। এজন্য ঘোষবাবুদের তরফ হইতে টাকাকড়ি লইয়া কালেক্টরীতে লোক প্রেরিত হইয়াছে এমন সংবাদও অনেকে শুনিতে পাইল।

প্রিয়নাথও শুনিলেন, শুনিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। হায়! চঞ্চলা যখন চঞ্চল হইয়াছেন তখন কার সাধ্য তাঁকে ধরিয়া রাখে? একদিন এমনি অষ্টমের নিলামে প্রিয়নাথের পিতামহ ধনঞ্জয় মল্লিক দশ হাজার টাকায় চল্লিশ হাজার টাকার এই জমিদারীটা কিনিয়া আনিয়াছিলেন। তখন চঞ্চলা উদয়গঞ্জের গোকুল সমাদ্দারের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া মল্লিকবংশে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আর আজ তিনি ঠিক তেমনি অষ্টমের নিলামে মল্লিকবংশকে ত্যাগ করিয়া আর-এক সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে কৃতার্থ করিতে চলিয়াছেন। প্রিয়নাথ তো তুচ্ছ, আজ বোধহয় রমানাথ মল্লিক বাঁচিয়া থাকিলেও মাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেন না। নদীর বাঁধ একবার ভাঙিলে কার সাধ্য সে-প্লাবনের প্রচণ্ড বেগ রোধ করিতেপারে!

প্রিয়নাথের মনে পড়িল, রমানাথ বাঁচিয়া থাকিতেই আর-একবার এমনি ভাবে চালানের টাকা লুট হইয়া গিয়াছিল এবং এমনি ভাবেই জমিদারী অষ্টমের নিলামে উঠিবার উপক্রম

করিয়াছিল। রমানাথ তখন রোগশয্যায়, কাজেই নিতান্ত নিরুপায় হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া শুধু দীর্ঘশ্বাসেই অন্তরের গভীর বেদনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রিয়নাথ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় মহালে-মহালে ঘুরিয়া তিনি টাকার যোগাড় করিয়া আনিয়া নিলামের আগেই কালেক্টরীতে কিস্তীর খাজনা দাখিল করিয়া জমিদারী রক্ষা করিয়া হাসিতে-হাসিতে ফিরিয়া আসিয়া জ্যেষ্ঠের পদধূলি লইয়া মাথায় দিয়াছিলেন। উত্থানশক্তিরহিত রমানাথ তুই হাতে কনিষ্ঠের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দাশ্রুপ্লাবিতমুখে বলিয়াছিলেন, "এ-যাত্রা যদি আমাকে আর উঠতে না হয় প্রিয়, তাতেও তুঃখ নেই। কারণ, আমার অবর্ত্তমানে আমার চেয়ে উপযুক্ত লোকের হাতেই জমিদারীর ভার দিয়ে যেতে পারবো।"

আজ সেই কথা মনে পড়িতেই আনন্দে, গর্ব্বে প্রিয়নাথের বুক যেন ফুলিয়া উঠিল, অতীত-বিক্রমের স্মৃতিতে রোগজীর্ণ তুর্ব্বল দেহেও এক নূতন শক্তির বিত্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হইল। মনে হইল, আজও সেই তুর্দ্দিন, তবে আজ রমানাথ নাই। না থাকিলেও, তিনি তো আছেন। এই তুর্দ্দিনে তিনি কি আর-একবার সিংহবিক্রমে উ য়া দাঁড়াইতে পারেন না, আর-একবার কি তেমনই করিয়া নিলামের কবল হইতে এই সম্পত্তিটুকু রক্ষা করিতে পারেন না? কিন্তু কার জন্য করিবেন? আর রক্ষা করিবার মতন সে শক্তিই-বা তাঁর আজ কোথায়? নিজের অক্ষমতা স্মরণে প্রিয়নাথ নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বিপদের উপর বিপদ। এইসময়ে প্রিয়নাথ আর-একটা দুঃসংবাদ পাইলেন, নলিন পুলিস হাঙ্গামায় পড়িয়াছে। তেনা বাউরীর পুত্রবধূর উপর নাকি নলিনের লুব্ধ-দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এবং ইদানীং সে বাউরীপাড়ায় সেই অন্ত্যজ তেনারামের বাড়ীতে তার অনুপস্থিতির সময় যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে তেনা বাউরী গত পরশু তার স্ত্রীর মুখে নলিনের দুরভিসন্ধির কথা শুনিয়া নলিনকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দেয়।....কী? ছোটলোক বাগ্দী-বেটার এতদূর স্পর্দ্ধা, জমিদারপুত্রকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে? নলিন ক্রুদ্ধ হইয়া দলবলসহ গত-কাল প্রকাশ্য দিবালোকে তেনারামের বাড়ী লুট করিয়াছে এবং সেইসঙ্গে তেনারামের পুত্রবধূকে হরণ করিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে তার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। এমন অবস্থায় পড়িলে মানুষ যা করে তেনা তাই করিয়াছে, সে অগত্যা পুলিসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাই পুলিস এখন নলিনকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

প্রিয়নাথ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এও কি সম্ভব? অভিজাত জমিদারবংশের—রমানাথ মল্লিকের ছেলে হইয়া নলিন বাগ্দীর ঘরের বউকে চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে? এ-কথাও আজ তাঁকে কানে শুনিতে হইল? মা বসুন্ধরে, তুমি দ্বিধা হও, আর এ ঘৃণ্য-জীবনে কি প্রয়োজন মা! ওঃ, লক্ষ্মীর অন্তর্ধানের সঙ্গে মান-সম্ভ্রম-গৌরব সবই একে-একে

অন্তর্হিত হইয়া গেল। তা না হইলে যে রমানাথ মল্লিক খুন করিলেও পুলিস তাঁর ছায়া মাড়াইতে সাহসী হইত না, আজ তাঁরই বংশধরকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সেই পুলিস ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর এ-কথা শুনিয়াও প্রিয়নাথ নির্জীবের মতন নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন! প্রিয়নাথের শিরায়-শিরায় বিদ্যুতের তীব্র জ্বালা ছুটিতে লাগিল।

সে জ্বালার প্রদাহ সহ্য করিতে না পারিয়া, উঠানে নামিয়া প্রিয়নাথ পায়চারি করিতে লাগিলেন।

রান্নাঘরে উনানশালে বসিয়া সহসা সেইসময় জানলার বাহিরে চোখ পড়িতেই আন্নাকালী তাড়াতাড়ি স্বামীর সামনে আসিয়া বলিল, "বলি, হ্যাঁগ্যা! কি হলো তোমার? ঘরে শুয়েছিলে, হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে উঠোনময় ঘুরে বেড়াচ্ছো, মাথা ঘুরে এখুনি প'ড়ে যাবে যে!"

এতক্ষণে যেন তীব্র-দাহে প্রলেপ পড়িল। সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "ও, হ্যাঁ। তাইতো। ঠিক বলেছো তুমি। কি জানো? মাথাটা আমার কে যেন চেপে ধ'রে হাতুড়ি পিটছে! বড় যাতনা হচ্ছে কিনা—তাই। যাক্,এক কাজ করো তুমি। ঘর থেকে আমার লাঠিটা এনে দাও দিকিন শীগগীর!"

-"লাঠি নিয়ে এখন কি করবে তুমি?"

—"একবার ডাক্তারের বাড়ী যাবো যন্ত্রণার ওষুধ আনতে।'

—"তা, হ্যাঁগা। টাকা? ওষুধের দাম দিতে হবে তো?'

ম্লান হাসিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "তা তো হবেই। তবে আমি যাচ্ছি শুধু ব্যবস্থা আনতে। ডাক্তার ভালো লোক। নিশ্চয়ই তিনি এমন কিছু গাছগাছড়ার নাম ব'লে দেবেন, যাতে এখুনি সেরে যেতে পারে।"

জলভরা চোখে আন্নাকালী স্বামীকে লাঠি আনিয়া দিল।

দুর্ব্বলের বন্ধু মোটা ছড়িটার উপর ভর দিয়া ধীরে-ধীরে প্রিয়নাথ বাহির হইয়া গেলেন।

*

* *

আসন্ন সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকার পথে ছুটিতে-ছুটিতে আসিয়া তেনা বাউরীর বউ সবেগে জমিদারবাড়ীর অন্দরে ঢুকিয়া উঠানে লুটাইয়া পড়িল।

শ্যামাসুন্দরী তখন ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাদীপ জালিবার জন্য সবেমাত্র পাটের কাপড় পরিয়া উপরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সহসা বাউরীগিন্নীর এই অবাঞ্ছিত ব্যাপার দেখিয়া ত্রস্তে বলিয়া উঠিলেন, "কি রে বাউরীবৌ, হঠাৎ কি হলো তোর যে এমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে একেবারে আছাড় খেয়ে পড়লি?"

তেনার বউ উঠিয়া বসিয়া কপাল চাপড়াইতে-চাপড়াইতে জানাইল, "হয়েছেক্ আমার ছরাদ মাঠান্, আর হবার বাকি কি গো, আমার সব্বোনাশ হয়েছেক্!"

—"সর্ব্বনাশটা কি তাই খুলে বল্ ?"

—"মাগো মা, আমার গাঁয়ের রাজা—আপনকার বেটা জমিদার গো ! সেই তো সব্বোনাশের গোড়া মা ! হায় কি কল্লাম…হায় কি হলোক্…ওরে আমার পোড়া বাগ্দীর কপালখানা রে !"বলিয়া আবার সেইরকম কপাল চাপড়ানো…

শ্যামাসুন্দরীর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল ; বলিলেন,"আমার ছেলে—নলিন ? সে কি সর্ব্বনাশ করেছে তোর ? শীগগির বল্, নইলে—"

—"বলবার তরেই তো এনু মাঠান্ ! তবে শুনো। আজ, তখনও দুপুর গড়ায়নি, কর্ত্তা আছেক্ ক্ষেতে, ছেলে জন খাটতে গ্যাছেক মাঠে, ঘরে আছি আমরা দুটি শাউড়ী-বৌ, বলি, তারা তো সব জলপান লিয়ে কাজে গ্যাছেক, বাছা বৌটাকে আর কেন কষ্ট দিই, কালকের পান্ত-ভাত আছেক, আমানি আছেক, পাঁ্যাজ আছেক, দুই মায়ে-বোয়ে আমরা খেয়ে লি। বলবোক্ কি মা, খোরা পেতে পান্ত বেড়ে মুখে গেরাস্টি তুলবোক্, হাতের ভাত হাতেই রয়ে গেল, আর ব্যাঁত্কে তুলতে হলোক্ নি মা ! ঠিক থ্যান্কালে তোমার বেটা, আমার গাঁয়ের রাজা এক দঙ্গল লোক লিয়ে বাঁশের বেড়া ঠেলে একেবারে দাওয়ার লগে এসে হাজির ! বলেক্, 'এই মাগী, খাওয়া থুয়ে আগে কথা শুন্ ! বামুনের মেয়ের জাত মারছিস্ ?' বল্লেক মা, আমার বেটার বৌকে দেখিয়ে সোজা বল্লেক্ 'আমি বামুন, আমার বৌকে তোরা আটক করেছিস্, শীগগির ওকে

ফিরিয়ে দে আমাদের হাতেক, না দিলে এখুনি তোর ঘর জ্বালিয়ে দুবোক্, দিয়ে তোকে আর উই বউটাকে বেঁধে লিয়ে চলে যাবোক্!' শুনে আমি মাঠান্ নিথর হয়ে গেনু, পড়ামুয়োটা বলেক্ কি গো—য়ঁ্যা? আমার বেটা লছিরাম, তার বিয়ে-করা বউ, সে হয়ে গেল বামুনের মেয়ে—বামুনের বউ? বল্লাম, আপনারা কি কথা কইছোক্ গো! তোমাদের চক্ষুতে কি ছানি নেগেছেক্ নাকি? আমরা বাউরী-বাগ্দী, আমার ঘরের বউ তোমাদের বামুন হবেক্ ক্যানে গো! তোমরা আন্ শুনতে ধান শুনেছোক্, ভালা চাও তো মায়ের বাছারা সব ঘরকে ফিরে যাও, খাবার সময় আর আমাদেরকে দিক্ কোরোনিক্!

কে কার কথা শুনে মাঠান্! বউকে ধরে লিবে ব'লে সব্বায় মিলে দাবায় উঠে-উঠে, এমন সময় আমি চিল্লিয়ে উঠলাম—কে কোথায় আছোক্ মা-বাপ, রক্ষে করোক্ গো! আমার সেই চেল্লানীর ধমকে পাড়ার লোক-জন ছুটে এসে কাণ্ড দেখে ক্ষেতে গিয়ে কর্ত্তাকে আর লছিরামকে খবর দিতেই, হেঁই-হেঁই ক'রে চেল্লাতে-চেল্লাতে কোদাল কুড়ুল-খোন্তা-কাস্তে লিয়ে চার-পাঁচগণ্ডা জন-মুনিষ তেড়ে আসতেই, বাপের বেটা মরদরা সব ভয়ে পরাণ লিয়ে ভীমরুলের মতন ভোঁ-দৌড়! ছুটে-ছুটে পালিয়ে এসেছেক্ মাঠান! আসবার সময় আবার শাসিয়ে এসেছেক, 'আচ্ছা, এখন যাচ্ছি আমরা, আজ রাতে কেমন ক'রে সামাল্ দিস্ তোর বউকে, আমরা দেখে লুবো।'

কি হবেক্ মাঠান্ ? তুমি এখন এর পিতিকার করো মাঠান ! আমার জাত-কুল তুমি না রাখলে আর কে রাখবেক্ মা ?”

এতক্ষণে শ্যামাসুন্দরী একটু প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন ; বলিলেন, “তা দেখ্ বাউরীবৌ, আমার ছেলে নলিন তো বামুন নয়, আর সে মিথ্যে কথা বলেও জাত ভাঁড়াবে না। তুই এসব কি বলছিস ? আমার ছেলেকে তুই চিনিস্ ?”

—“হায় লাও মা, ‘চিনিস্’ কি গো ! আমার গাঁয়ের রাজাকে চিন্‌বোক্ নি ক্যানে ? সে কি বলেছেক্ ? তার দলের সেই পিল্‌সাজের মতন রোগা জনটা গো ! তার গলায় যে ধবধবে পৈতের গোছা আপন চক্ষে দেখনু মাঠান্। আপনকার সামনে মিছে বলি তো দুটি চক্ষের মাথা খাই যেন ! সেই আবাগীর বেটা বামুনটাই তো বল্লেক্ মা ! চুলোয় যাক্ সে কথা। এখন বউকে কি ক’রে সামাল্ দিবোক্ মা, তার একটা উপায় ক’রে দাও।”

শ্যামাসুন্দরীর মুখ কালো হইয়া গেল—ছি-ছি, তাঁর নলিনের এতদূর অধঃপতন হইয়াছে ? ভাবিতেও যে গায়ের রক্ত হিম হইয়া আসে ! কিন্তু ভাবনা পরে। এখন সত্যই বউটাকে রক্ষা করিবার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। আজ আবার অমাবস্যা। আজ রাত্রে—

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, “আচ্ছা বাউরীবৌ, তোর সোয়ামী আর বেটা এর কিছু বিহিত করতে পারলে না ?”

বাউরীবৌ বলিল, “তারা আর কি করবেক্ মাঠান্, রাজার

কর্ম্মে কে বাধা দিবেক্ বলো? আমার কর্ত্তা ছুটতে-ছুটতে থানায় খবর দিতে গ্যাছেক্…আমি মরতে-মরতে তোমার কাছ্কে ছুটে এনু। আমার হয়েছেক্ মা, 'ছাম্ রাখি কি কুল রাখি'….থানার নোকেরা যদি আপনকার জমিদার বেটাকে ধ'রে লিয়ে যায়, তোমার কোপে আমার সাত পুরুষের বাস উঠবেক্ এথান্ হতে, তার আগে যদি আমার বেটা লছিরাম খুন করেক্ তোমার বেটাকে, তবে কি সব্বোনাশ হবেক্ মাঠান্! সেই ভয়েই তো ছুটে এনু গো! আপুনি ব'লে দাও মাঠান্, দুই দিক সামাল্ দিতে এখন তুমি ছাড়া আর কেউ নার্বেক।"

শ্যামাসুন্দরী বিব্রত হইয়া পড়িলেন—চিন্তার অবসর নাই, যুক্তি-পরামর্শ দিবার মতন বন্ধু নাই। এমন সময় হঠাৎ উঠানের পাশের জানলার ফাঁক দিয়া দেখিলেন, লাঠিতে ভর দিয়া প্রিয়নাথ কাছারীবাড়ীতে ঢুকিতেছেন। তখন যুক্তকরে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রার্থনা জানাইলেন, "ঠাকুর! তুমি ঠিকই আছো! প্রাণের আকুল নিবেদন যখন তোমার চরণে পৌঁছিয়াছে প্রভু, তখন তুমিই এ-বিপদে রক্ষা করো—এ-দুঃসময়ে আর বিমুখ হয়ো না!"

দূর হইতে দেবরকে কাছারীবাড়ীতে ঢুকিতে দেখিয়া শ্যামাসুন্দরী যেন অকূলে কূল পাইলেন। বাউরীবৌকে বুঝাইয়া বলিলেন, "শোন্ বৌ, তুই এখন ঘরে ফিরে যা, গিয়ে আজ রাতটার মতন একটা ঘরে তোর বৌকে চাবি বন্ধ

ক'রে রাখ্‌গে! কাল সকালে আমি এর বিহিত করবো। আমার যথাসর্ব্বস্ব খুইয়েও তোর বৌকে যদি রক্ষা করতে হয়, জেনে যা, তাতেও আমি কাতর হবো না।"

বাউরীবৌ যেমন ছুটিতে-ছুটিতে এখানে আসিয়াছিল, জমিদার-মাতাঠাকুরাণীর মুখে অভয় পাইয়া তেমনি মরিয়া হইয়া দ্রুতপায়ে আবার বাগ্দী-পল্লীর দিকে চলিয়া গেল।

*

*　　*

লাঠিতে ভর দিয়া প্রিয়নাথ বহু কষ্টে কাছারীবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বৈদ্যনাথ তখন মামলার কাগজপত্র লইয়া খুব ব্যস্ত থাকিলেও সহসা প্রিয়নাথকে দেখিয়া দারুণ বিস্ময়ে ওঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রিয়নাথ বলিলেন,"পুলিস নাকি নলিনকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে?"

বৈদ্যনাথ উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ। সেই কথাই তো শুনলাম।"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "আপনি থাক্‌তে? ....এটা কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা বদ্যিনাথবাবু।"

মুখে আকস্মিক বিপদের একটা ভাব আনিয়া বৈদ্যনাথ

বলিলেন, "আমি কোন্ দিক রক্ষা করবো বলুন? এদিকে জমিদারী যে যায়!"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "তাকে রক্ষা করতে পারবেন কি?"

—"বোধহয় পারলাম না। তিন দিনের মধ্যে পনেরো হাজার টাকা সংগ্রহ করা কি সহজ কথা?"

—"খুবই কঠিন। কিন্তু নলিনকে রক্ষা করা বোধকরি তেমন কঠিন নয়?"

—"সেটা আরও কঠিন। কারণ, বিপক্ষ-পক্ষ গরীব ব'লে, পুলিসসাহেব নিজে তদন্তের ভার নিয়েছেন।"

—"এমন অনেক সময় গিয়েছে যখন স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তদন্তের ভার নিয়েও কিছু করতে পারেন নি।"

বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন, "সে-সব দিনকাল এখন আর নেই ছোটবাবু, এখনকার আইন-কানুন যেমন কড়া, তেমনি বেয়াড়া!"

ঈষৎ হাসিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "সে-সব দিনকালের কথা আমার অজানা নেই বদ্যিনাথবাবু, আইন যে চিরকালই কড়া তা জানি। কিন্তু আপনিও জেনে রাখুন যে, বাঁধন যেখানে যত শক্ত, গেরো সেখানে তত আল্‌গা।"

বৈদ্যনাথ এ-কথার জবাব দিলেন না। গম্ভীর ভাবে বসিয়া একখানা খাতার পাতা উল্‌টাইতে লাগিলেন।

প্রিয়নাথ ওঁর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহ'লে নলিনকে আপনি বাঁচাতে পারবেন না?"

বৈদ্যনাথ বলিলেন, "কৈ, তেমন উপায় তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

প্রিয়নাথ ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন ; একটু তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু আপনি উপায় দেখতে না পেলে আর কে দেখতে পাবে বলুন ?"

বৈদ্যনাথ এবার একটু রুষ্ট ভাবে উত্তর করিলেন, "আমার চেয়ে যদি কেউ নলিনের হিতৈষী থাকে তবে তিনি দেখতে পারেন !"

প্রিয়নাথের কপাল কুঞ্চিত হইল ; একটু ভাবিয়া বেশ রুক্ষস্বরে বলিলেন, "আপনার চেয়ে হিতৈষী যে কেউ নেই এমন কথা মনে করবেন না বদ্যিনাথবাবু ; খুঁজলে কেউ-না-কেউ বেরুবেই। আর যারা বেরুবে তারা আপনার মতন এত নিরুপায় নয় জেনে রাখবেন।"

বৈদ্যনাথ কঠোরদৃষ্টিতে প্রিয়নাথের মুখের দিকে চাহিলেন। ওঁর সে কঠোরদৃষ্টিটাকে একটা তাচ্ছিল্যের হাসিতে উড়াইয়া দিয়া প্রিয়নাথ উঠিবার উপক্রম করিলেন। এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে ভৃত্য আসিয়া জানাইল যে, বড়মা তাঁর সঙ্গে এখন একবার সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছেন।

প্রিয়নাথ বসিয়া একটু ভাবিলেন ; তারপর উঠিয়া ধীরে-ধীরে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

*
*　　*

প্রিয়নাথ অন্দরে ঢুকিতেই শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আবার এই রোগা দেহ নিয়ে তুমি কেন এসেছিলে ঠাকুরপো ?"

প্রিয়নাথ উত্তর করিলেন, "নলিনকে পুলিসে গ্রেপ্তার করেছে কি না তাই দেখতে এসেছিলাম।"

শ্যামাসুন্দরী মৃদু হাসিলেন ; বলিলেন, "দেখতে এসেছিলে, না তাকে পুলিসের হাত থেকে রক্ষা করতে এসেছিলে ?"

—"সে শক্তি যে আমার নেই বৌঠান !"

—"নেই তা জানি, কিন্তু চুপ ক'রে ব'সে থাকার শক্তিও তো নেই !"

প্রিয়নাথ একটু হাসিয়াই সে-কথার জবাব দিলেন।

শ্যামাসুন্দরী এবার বেশ তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "রক্ষা করবার শক্তি নেই, তবু এই জ্বরা-মরা দেহ নিয়ে কেন ছুটে এসেছো বলো তো ?"

—"তুমিই বলো না কেন এসেছি !"

—"হয় নলিনকে, নয় জমিদারীটা রক্ষা করতে এসেছো।"

—"তা নয় বৌঠান, তা নয়। যে লক্ষ্মীকে তুমি আগলে রেখেছিলে, বাড়ীর বার হতে দাও নি, সেই লক্ষ্মী এখনো তোমার ঘরে আটক আছেন কি না তাই দেখতে এসেছি।" বলিয়া প্রিয়নাথ এমন উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিলেন যে,

শ্যামাসুন্দরীকে দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া নীরবে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

প্রিয়নাথ বলিলেন, "যাক্, লক্ষ্মীকে আগলে রাখতে পেরেছো কি না এখন সেই কথা বলো।"

শ্যামাসুন্দরী গ্রীবা উন্নত করিয়া সগর্ব্বকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "রাখতে পেরেছি কি না সে খোঁজ নিতে তোমাকে কে ডেকেছে ঠাকুরপো ?"

সহাস্যে প্রিয়নাথ বলিলেন, "ডাকবার সাহস নেই বলেই কেউ আমাকে ডাকে নি বৌঠান ; আমাকেই সেধে আসতে হয়েছে।"

—"এসে তুমি কি করবে ?"

—"তুমি কি করতে বলো ?"

—"আমি যা বলবো তা পারবে ?"

একটু ভাবিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "বদ্যিনাথবাবু সেদিন আমাকে উদ্দেশ ক'রে বলেছিলেন—'মরা হাতির দাম লাখ টাকা'। তা আমি একেবারে মরা হাতি না হলেও, আর লাখ টাকা দিয়ে আমাকে কেউ কিনতে না চাইলেও এই মরণাপন্ন প্রিয় মল্লিক এখনো এমন অনেক কাজ করতে পারে বৌঠান, যা বড়-বড় ফন্দীবাজ ধুরন্ধররা পারবে না।"

শ্যামাসুন্দরী দেবরের মুখের দিকে চাহিয়া ধীর-গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তাহ'লে তুমি পারবে ?"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "পরখ করতে চাও নাকি ?"

—"হ্যাঁ, এসো।"

বলিয়া শ্যামাসুন্দরী ধীরে-ধীরে চলিতে সুরু করিলেন, প্রিয়নাথ বৌঠানের অনুসরণ করিলেন।

ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া শ্যামাসুন্দরী প্রিয়নাথকে বলিলেন, "ভেতরে এসো।"

দরজার বাহিরে দাঁড়াইযা প্রিয়নাথ বলিলেন, "এ-কাপড়ে আর ঠাকুরঘরে ঢুকবো না, কি বলবার আছে বলো।"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "বলবার এমন বিশেষ কিছু নেই, তবে তোমাকে দেবার কিছু আছে।"

—"আমাকে আর কি দেবে বৌঠান?"

—"যা তুমি এতদিন চেয়ে পাও নি, শুধু লড়াই-ঝগড়া ক'রে এসেছো!"

প্রিয়নাথ বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তাহ'লে কি লক্ষ্মীর-কৌটা? লক্ষ্মীর-কৌটা তুমি আমাকে দেবে বৌঠান?"

—হ্যাঁ, খুব খুশী হয়ে দেবো বলেই তোমায় ডেকেছি।"

প্রিয়নাথ আগ্রহপূর্ণদৃষ্টিতে কুলঙ্গীর উপর সিংহাসনাধিষ্ঠিত সিঁদুর-চন্দন-মাখানো কৌটার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "কি ভাবছো?"

—"ভাবছি, এতদিন পরে…"

—"বৌঠানের দয়া হলো—না? হ্যাঁ, এই ঠিক দেবার সময়। …তুমি নিতে পারবে না?"

প্রিয়নাথ নীরবে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "ভাববার আর বেশী সময় নেই ঠাকুরপো! ঠিক ক'রে বলো, নিতে পারবে কি না?"

প্রিয়নাথ জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "নিতে পারি বৌঠান, কিন্তু আজ নয়।"

—"তবে কবে?"

—"আগে মাকে রাখবার মতন নিরাপদ জায়গা খুঁজে দেখি।"

—"এখন তাহ'লে কি করবে?"

—"এখন আর-একবার বৈদ্যিনাথবাবুর কাছে যেতে হবে।"

—"সেখানে গিয়ে কিছু হবে না।"

—"তা জানি। তবু যেতে হবে—মানে, তিনি এখনকার বেনামীতে জমিদারীটা ডেকে নেবেন ভাবছেন কিনা; তাঁর কাছে যাবার এই ঠিক উপযুক্ত সময়।"

ভীষণ চমকাইয়া উঠিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তুমি তাহ'লে সব জানো?"

উত্তরে প্রিয়নাথ শুধু একটু হাসিলেন।

শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "জানো যদি, তবে আবার সেখানে যেতে চাইছো কেন?"

সহাস্যে প্রিয়নাথ বলিলেন, "যুক্তি-পরামর্শ নেবার জন্যে নিশ্চয়ই নয়; আমি যেতে চাইছি, এই দুর্ব্বল দেহ নিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ী যেতে পারবো না, তাই একবার পাল্কীখানা ভিক্ষে করবো তাঁর কাছে।"

এই পাল্কী ভিক্ষা করার পিছনে দেবরের একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে বুঝিয়া শ্যামাসুন্দরীর নৈরাশ্যকাতর মুখে সহসা আশার জ্যোতি ফুটিয়া উঠিতেই উনি ঠাকুরঘর হইতে বাহিরে আসিয়া প্রিয়নাথের সামনে দাঁড়াইলেন।

প্রিয়নাথ বলিলেন, "তাহ'লে আমি এখন যাই বৌঠান!"

শ্যামাসুন্দরী হঠাৎ দেবরের একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু নলিন—নলিনকে বাঁচাবার কি হবে ঠাকুরপো?"

নিঃশব্দ-হাসি হাসিয়া প্রিয়নাথ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "আগে নলিন, তারপর জমিদারী, বৌঠান!"

শ্যামাসুন্দরীর দুই চোখ দিয়া দরদরধারে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

বাহিরে আসিয়া প্রিয়নাথ আবার বৈদ্যনাথের সহিত দেখা করিলেন এবং বাড়ী ফিরিবার জন্য একখানা পাল্কী দিতে অনুরোধ করিলেন।

বৈদ্যনাথ সেই মুহূর্ত্তে পাল্কী দিতে আদেশ দিলেন।

পাল্কীতে উঠিয়া কাছারীবাড়ীর বাহিরে আসিয়াই প্রিয়নাথ বাহকদিগকে অনুচ্চস্বরে আদেশ করিলেন, "রহিমপুর সদর থানা।" বলিয়াই তিনি পাল্কীর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

পাল্কী-বেহারারা মৃদুগুঞ্জনে সুর করিয়া দুর্ব্বোধ্য শব্দ করিতে-করিতে থানার রাস্তা ধরিয়া চলিতে সুরু করিল।

*

*   *

এই ঘটনার একদিন আগেকার কথা।

অমাবস্যার তমিস্রা রাত্রি। ভয়াবহ সেই স্তব্ধ মহানিশায় জনহীন পল্লীপথের পাশে অসমঞ্জস গাছের জঙ্গলের ভিতর হইতে দুটি মানুষের কণ্ঠস্বরে বাষ্পীয়-আওয়াজে অসংলগ্ন সংলাপ চলিতেছিল :

—"সব ঠিক ?"

—"হ্যাঁ হুজুর।"

—"চুপ্ চুপ্! চীৎকার কোরো না। আস্তে কথা কও। হাওয়ারও কান আছে। যা জিগেস্ করবো শুধু তার জবাব দেবে। ...ভিন-গাঁয়ের ক'জন ?"

দ্বিতীয় মানুষের ওষ্ঠাধরের ফাঁকে ফিস্‌ফিসানি স্বর ভাসিল—"তেইশ জন, হুজুর।"

—"গাঁয়ের ?"

—"একজনও না।"

—"সাবাস্। তারা পথ চেনে ?"

—"বুঝিয়ে দিয়েছি হুজুর!"

—"সবাই পাকা খেলোয়াড় ? ...হট্‌বে না তো ?"

—"না হুজুর, দু'জন সর্দ্দার আছে তাদের সঙ্গে।"

—"বেশ। মশাল নিয়েছো ক'টা ?"

"আপনি যা হুকুম করেছিলেন....দুটো।"

—"ঠিক হয়েছে। এখন শোনো! যতক্ষণ না আমি এই বাঁশীটা বাজাই, মশাল জ্বালবে না...মনে থাকে যেন। আর একটা কথা। এই টর্চ্চের বাতিটা কাছে রাখো। আমার কাছেও একটা রইলো। আমি টর্চ্চ জ্বাললেই তুমি সেইদিকে টর্চ্চ জ্বালবে; তারপর যা করতে হবে আমি জানিয়ে দেব সেই সময়—নাও।"

বলিয়াই একটা টর্চ্চ জ্বালিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে আর-একটা টর্চ্চ দিয়াই সেই মুহূর্ত্তে নিজের টর্চ্চটা নিভাইয়া দিল।

আবার অন্ধকার!

সেই মসীমলিন নিরন্ধ্র অন্ধকারে অলক্ষ্যে থাকিয়া মহাকাল তাঁর খাতার পাতায় সব লিখিয়া, মূর্ত্তি দুটির চিত্র আঁকিয়া লইলেন।

কৃষ্ণপক্ষের চরম রাতে সেই আঁধারের রঙে রঙ-মেশানো কালো ছাতার কাপড়ে শুধু চোখের সামনে দুটি ছিদ্র বাদে আপাদমস্তক মুড়ি-দেওয়া প্রথম ব্যক্তি আবার ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিল, "তোমার বন্ধু? বন্ধুর কাছে তোমার ছদ্মরূপ ধরা পড়েনি? সে জানতে পারেনি যে তুমি নিজেকে লুকিয়ে এতদিন তার সঙ্গে শুধু বন্ধুতার ভান ক'রে এসেছো?"

—"মোটেই না হুজুর। আপনার যা-যা আদেশ ছিল আমার ওপর, সব সময় খুব সাবধানে তা পালন ক'রে এসেছি। প্রথম-প্রথম বন্ধু আমার ও-পল্লীতে যেতে চাইতো না...ক্রমে

মাছ ধরার নেশা যখন পেয়ে বসলো তাকে তখন এ-পুকুর সে-পুকুর···আরও দূরে কোন্-কোন্ পুকুরে বেশী মাছ আছে, 'চার' ফেললেই বড়-বড় রুই-কাতলা পর্য্যন্ত টুপ্ ক'রে টোপ্ গিল্‌বে মতলব দিয়ে শেষে ওই বা—"

—"আ-আ-আঃ! তুমি বড় বেশী বকো। না। সংক্ষেপে এক-কথায় শুধু আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও—হ্যাঁ, শোনো, কোন্ পথ দিয়ে কোথায় গিয়ে পৌঁছোতে হবে বলো তো? দেখি কেমন কাজ গুছিয়েছো?"

—"আজ্ঞে হুজুর, সামনের ওই ঝোপের পাশ থেকে যে দুটো পথ দুদিকে এঁকে-বেঁকে গেছে, তারই পূব্‌দিকের পথটা ধ'রে সোজা চ'লে যাবো রাজহাটির দিকে, তারপর পোয়া-তিনেক হাঁটলেই সেই ঘন আমবাগানের আবছায়ায় যে ডাকাতে-কালীর ভাঙা মন্দিরটা আছে, তারই পেছনে গোমস্তা গোকুলের একতলা কোঠায়। ···এক-কথায় আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না ব'লে মাপ করবেন হুজুর!"

হুজুর বোধকরি এবার খুশী হইলেন; বলিলেন, "বেঁচে থাকো বাবা লোকনাথ! তুমি ধূর্ত্ত জেনেই একগোছা পৈতে তোমার গলায় চাপিয়ে তোমায় বামুন সাজিয়েছি। সে রত্ন কি ব্রাহ্মণের কণ্ঠহারে না থাকলে মানায়? না লোকে বিশ্বাস করে? যাক, শোনো। তুমি থাকবে দলের আগে পথ চেনাবার জন্যে। কারণ, লড়ায়ে যখন দু'দল মেতে উঠবে জ্ঞানহারা হ'য়ে, তখন তোমার জ্ঞান যেন ঠিক টন্‌টনে থাকে। মানে, পথ

ভুলে উল্টো পথে গেলেই মাঝ-রাস্তায় পড়বে পুলিসের ফাঁড়ি। তাদের ঘাঁটির সীমানায় ঢুকলেই—বুঝেছো? একেবারে দ্বীপ-চালান!"

দ্বীপান্তরের নাম শুনিয়া লোকনাথের বুকটা সহসা ধক্ করিয়া উঠিল। কোনমতে সামলাইয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "আজ্ঞে হুজুর, বুঝেছি। একেবারে 'আন্দামান্'।"

—"না। আন্দামান্ নয়। আন্দামানে যায় বোকারা—যারা ধরা পড়ে। তুমি চতুর, বুদ্ধিমান্। তুমি পাবে মহা মান। কাজ যদি হাঁসিল করতে পারো আজ রাতে, কাল সকালে তুমি একেবারে মানী লোক হয়ে যাবে—মানে, পাঁচশো টাকার মালিক। গোবরে যে পদ্মফুলটি ফুটে আছে, সেটি চাই আমার, আর তুমি না চাইতেই পাবে এই থলিটা, যদি আজ লড়াই ফতে করতে পারো।" বলিয়া দপ্ করিয়া একবার টর্চ্চ জ্বালিয়াই কালো পোষাকের ভিতর হইতে একটা সাদা থলি বাহির করিয়া দেখাইল—তার মধ্যে পাঁচশো টাকার নোট আছে। তারপর আবার একবার টর্চ্চের আলোয় গলায়-ঝোলানো কালো 'কার'-এ বাঁধা 'ওয়াচ-ঘড়ি'টা দেখিয়া বাতি নিভাইয়া বলিল, "আর কথা নয়। রাত এখন দেড়টা। এই ঠিক সময়; গোমস্তা গোকুল তার বাড়ীর দরজায় আন্‌চান ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে এতক্ষণ। তুমি চলে যাও। আমার টাট্টুতে সওয়ার হয়ে আমি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় হাজির হবো;....লাঠিয়ালরা সব কোথায়?"

—"ওই ঝোপটার আড়ালে হুজুর!"

—"আচ্ছা, যাও।"

আবার সব নিস্তব্ধ। দুটি বুভুক্ষু জাত-সাপ যেন ফণা তুলিয়া কিছুক্ষণ হিস্‌হিস্‌ শব্দে ফুঁশিতে-ফুঁশিতে এতক্ষণে শিকার অন্বেষণে দুইদিকে চলিয়া গেল!

*

* *

নিশি দ্বিপ্রহরে এদিকে যখন এইসব ঘটনা ঘটিতেছিল, ঠিক সেইসময় নিয়তির লীলাচক্রের আবর্ত্তনে জমিদারবাড়ীর অন্দরে এক অঘটন ঘটিয়া সব উলটপালট হইয়া গেল।

আজ সন্ধ্যায় বাউরীবৌকে আশ্বাস দিলেও তার পুত্রবধূকে আজ রাত্রে রক্ষা করিবার মতন কোন উপায় শ্যামাসুন্দরী ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না।

আজ আবার অমাবস্যা। সারা দিনটা সামান্য ফলমূল খাইয়া প্রায় অর্দ্ধাহারে কাটিয়াছে, তার উপর দারুণ দুশ্চিন্তায় শরীর অবসন্ন। ছি, ছি, তাঁর সন্তান নলিনের এই ঘৃণ্য কাজ? অভিজাত জমিদারবংশের কুলপ্রদীপ নলিন তার বংশমর্য্যাদা ভুলিয়া, পিতৃপিতামহের গৌরবদীপ্ত নামে একেবারে এমন

কলঙ্কের কালি লেপিয়া দিবে যে, কাল সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে জগতের লোকের কাছে আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না! এও তাঁর অদৃষ্টে ছিল? তার আগে তাঁর যে মৃত্যু হওয়াই উচিত ছিল। শ্যামাসুন্দরী আর ভাবিতে পারেন না। দুই হাতে কপাল টিপিয়া উপরের বারান্দায় আনমনে বসিয়া আছেন, এমন সময় নলিনের আহ্বানে ধীরে-ধীরে মাথা তুলিয়া সেদিকে চাহিলেন; বলিলেন, "এই অন্ধকার রাতে এত ঘটা ক'রে সেজেগুজে কোথায় যাচ্ছিস্ নলিন?"

মুচকি হাসিয়া নলিন বলিল, "ঘটা আর কোথায় দেখলে মা? ধোয়ানো কাপড়-জামা প'রে বেরুচ্ছি, পাশের গাঁয়ে এক বন্ধুর বাড়ী আজ নেমন্তন্ন আছে ব'লে। ফিরতে আমার একটু রাত হবে তাই রামপ্রকাশ দরোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, দেরী হ'লে তুমি ভেবো না।"

—"পাশের গাঁয়ে তোর কোন্ বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন? যে রোগা লম্বা বামুন-ছেলেটি রোজ তোর সঙ্গে-সঙ্গে ঘোরে সেই লোকনাথঠাকুরের বাড়ী?"

মা'র মুখে লোকনাথের নাম শুনিয়া নলিনের পমেটম্-মাখা মুখখানা হঠাৎ কালো হইয়া গেল—মা কি অন্তর্য্যামিনী নাকি? আমার এত ইয়ার-বন্ধু থাকিতে মা কি করিয়া জানিলেন যে আমি এখন লোকনাথের বাড়ী যাইতেছি? যাই হোক্, সে হটিবার ছেলে নয়। নিজেকে সামলাইয়া বেশ সংযত ভাবেই বলিল, "হ্যাঁ মা। আজ তার জন্মতিথি কিনা, সামান্য একটু

আয়োজন করেছেন তার মা, আমায় বিশেষ ক'রে অনুরোধ করেছেন যেতে, না গেলে দুঃখ করবেন।"

বেদনা-বিজড়িত স্বরে মা ডাকিলেন, "নলিন ?"

এরকম ডাক নলিন জীবনে কোনদিন শোনে নাই তাই নির্ব্বাকে শুধু মা'র মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মা বলিলেন, "আজ তোর যাওয়া হবে না, বাড়ীতেই থাকতে হবে তোকে।"

—"সে কি মা, আমি যে কথা দিয়ে এসেছি তার মাকে, আমি নিশ্চয়ই আসবো।"

—"আমিও একজনকে কথা দিয়েছি যে, আজ রাত্রে আমার ছেলে আমার কাছেই থাকবে—বাড়ী থেকে বেরুবে না।"

—"এর কারণ তো আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আজ তার জন্মতিথি—"

—"না। আজ রাত্রে তার মৃত্যু-যোগ আছে। আজ আমি তোকে কিছুতেই সেখানে যেতে দেবো না।"

—"তুমি এসব কি বলছো মা ? ....দু'হাতে মাথা টিপে বসেছিলে, তোমার মাথার অসুখ হলো নাকি ?"

—"হ্যাঁ।"

—"সব কথা খুলে বলো! ...ডাক্তার ডাকবো ?"

—"না। ডাক্তার আমার এ যন্ত্রণা সারাতে পারবে না। আর—আর সব কথা খুলে বললে তুই আমার সামনে আর

মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবি নি। ছি ছি, তোর এত অধঃপতন হয়েছে? মা হয়ে ছেলের সামনে আজ সেই নীচ কথা মুখ ফুটে খুলে বলতে হবে? এর চেয়ে যে আমার মরণ ছিল ভালো।"

—"কাকে তুমি কথা দিয়েছো মা?"

—"যাকে তোরা আজ জোর-গলায় শাসিয়ে এসেছিস, আজ রাত্রে তার সর্ব্বনাশ করবি, সেই বাউরীগিন্নীকে।"

চতুর নলিনের আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, তেনা বাউরীর বৌ আসিয়া মা'র কাছে সব কথা ফাঁশ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু ধরা পড়িয়াও নলিন ভয় পাইল না; বলিল, "তুমি ভুল বুঝেছো মা। ওই বাউরীবৌ-এর ডাকাত ছেলে কি সাংঘাতিক কাজ করেছে জানো? এক নিরীহ বামুনের বৌকে তাদের ঘর থেকে ডাকাতি ক'রে নিয়ে এসে তাকে তার নিজের বৌ ব'লে পরিচয় দিয়ে আটক ক'রে রেখেছে। তোমার ছেলে উচ্ছৃঙ্খল হতে পারে, কিন্তু সত্যিই তার এত অধঃপতন হয়নি যে—"

"—নলিন?"

—"এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি মা, আজ দুপুরে আমি দলবল নিয়ে সেই বামুনের বৌকে শুধু উদ্ধার করবার জন্যে সেখানে গিয়েছিলাম। সেটা কি আমার অপরাধ?"

—"কে তোকে বললে যে সে বামুনের বৌ?"

—"তার স্বামীই বলেছে। সেই মেয়েটি আমার বন্ধু

লোকনাথের বিয়ে-করা বৌ। তেমন চমৎকার মেয়ে কখনো বাউরী-বাগ্দীর ঘরে জন্মায় না—তুমি তাকে দেখেছো মা ?”

ছেলের কথা শুনিয়া মা বুঝিলেন, নলিন ভীষণ চক্রান্তের মধ্যে পড়িয়াছে। হয়তো তাঁর পুত্র সত্যই নিরপরাধ। কিন্তু এইসব ষড়যন্ত্রকারীর মূল কে ? কেনই-বা তারা একে এমন ভ্রান্তপথে চালনা করিতেছে—তাদের উদ্দেশ্য কি ? যাক্, সে-সব পরে চিন্তা করা যাইবে ভাবিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “ছেলের কাছ থেকে মাকে কি আজ তার মামারবাড়ীর সন্ধান নিতে হবে নাকি ? সেদিনকার ছেলে তুই, তোর জন্মাবার অনেক আগে থেকেই যে আমি আমার প্রজাদের অন্ধিসন্ধি খুঁটিনাটি সব খবর জানি রে ! সুন্দরী হলেই যে সে বামুনের মেয়ে-বৌ হবে এমন পাগলের মতন কথা তোকে কে শেখালে বল্ তো ? না। সে বামুনের মেয়ে নয়। আমি ঠিক জানি সেই অপরূপ সুন্দরী মেয়েটি তেনা বাউরীর ছেলে লছিরামের বিয়ে-করা বৌ। আমার কথা শোন্। ওসব পাগলামি কথা ছেড়ে দিয়ে আজ রাত্রে খেয়ে-দেয়ে শান্ত ছেলেটির মতন তুই ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়্। আজ আর আমি তোকে বাড়ী থেকে বেরুতে দেবো না।”

ব্যস্ত হইয়া মায়ের পা-দুটি জড়াইয়া ধরিয়া নলিন বলিল, “তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা, আমার দলের লেঠেলরা সব তৈরী হয়ে আছে লড়াই ক’রে লোকনাথঠাকুরের বৌকে বাউরীদের ঘর থেকে ছিনিয়ে বের ক’রে আনবার জন্যে।

শুধু আজকের রাতটার মতন আমায় হুকুম দাও এই সৎকাজটা করবার জন্যে সেখানে যেতে।”

শ্যামাসুন্দরী এবার উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, “সৎকাজ? হ্যাঁ, সৎকাজই বটে। ওরে পাগল ছেলে, আরও সৎকাজ করা হবে তুই সেখানে না গিয়ে আজ রাতটা যদি আমার কাছে থাকিস্।”

নলিন বলিল, ‘‘কিন্তু মা, আমি এখন না গেলে, আমার দেরী দেখে যে লোকনাথ তার দলবল নিয়ে এখুনি আমায় বাড়ীতেই ডাকতে আসবে!”

—‘‘এলে আমি তাকে বুঝিয়ে বল্‌বো'খন্। এখন তুই আমার অবাধ্য না হয়ে আজ রাতটা আমার কাছেই থাক্।”

নিরুপায় নলিন আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া শান্ত সুবোধ ছেলেটির মতন মায়ের আদেশ পালন করিবার জন্য আহারাদির পর ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

উদ্বিগ্নচিত্তে সারা রাত শ্যামাসুন্দরী জাগিয়া কাটাইলেন।

সে-রাত্রে লোকনাথ আর নলিনকে ডাকিতে আসিল না।

*　　*

নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভাগিনেয় শ্রীমান্ নলিনচন্দ্রকে উচ্ছন্নের পিছল-পথে ঠেলিয়া দিতে মাতুল শ্রীবৈদ্যনাথ সরকার মহাশয়ের চেষ্টার আর অবধি ছিল না। সেই স্কুল ছাড়াইয়া বাড়ীতে বসিয়া তাঁর কুমন্ত্রে-দীক্ষিত মাষ্টারের কাছে বিদ্যার্জ্জন করিবার কুপন্থা হইতে সুরু করিয়া, অধঃপতনে পড়িবার যত-রকম ঘৃণ্য উপায় আছে তার প্রত্যেকটি প্রয়োগ করিতে তিনি সময়-সময় আহার-নিদ্রা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া কোমর বাঁধিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতেন।

অল্পবয়সে একটা জমিদারী-ষ্টেটের মালিক হইলে যা হয়, ক্রমে নলিনও সেই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়া মাতুলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার সহায়ক হইল! তবে নলিনের প্রকৃতিতে যতই উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া আশ্রয় করুক, অভিজাতবংশের দুলাল নলিনচন্দ্র লাম্পট্য-কলঙ্ককালিমার অপবাদ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া বরাবর দূরেই রহিল। মাতুল চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু 'দুরাত্মার ছলের অভাব নাই'। অনেক চিন্তার পর তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। সেই কথাই বলি :

ভগিনী শ্যামাসুন্দরীর হাত হইতে ভাগিনেয়ের অভিভাবকত্ব এবং জমিদারী পরিচালনার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিবার

কিছুদিন পরে একদা এক ফাল্গুন-অপরাহ্ণের সিঁদুর মাখানো গোধূলিতে দূর গ্রাম হইতে পদব্রজে ফিরিবার পথে, পাশের শ্যামলক্ষেত্রে তিনি একটি খর্ব্বাকৃতি জীর্ণ ঘোটক আবিষ্কার করেন। পিতৃ-মাতৃপরিত্যক্ত ঘোড়াটি আস্তাবল-বৈরাগ্য লইয়া ভবঘুরের মতন ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সম্প্রতি সেই ক্ষেত্রে নব উন্মেষিত দূর্ব্বা-ঘাস পাইয়া তার ক্ষুন্নিবারণ করিতেছিল।

নিত্য দূর-দূরান্তরে যাইবার পক্ষে নিখরচায় এরকম একটি যান পাইয়া বৈদ্যনাথ বর্ত্তাইয়া গেলেন। ঘোড়াটিকে লইয়া আসিয়া জিন-রেখাব ইত্যাদি চর্ম্ম-সজ্জায় ভূষিত করিয়া তিনি অতঃপর সেই ঘোড়াটিকে বাহন করিয়া সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেন। গ্রামের বর্ব্বর লোকেরা ঘোড়াটির নাম দিয়াছিল—'ঘীয়ে-ভাজা-ঘোড়া'। তিনি বলিতেন তাঁর সখের 'টাট্টু'।

ক্রমে সখের টাট্টুটি পোষ মানিল···প্রভুর মনের ইচ্ছা বুঝিল···নিজের গ্রাম এবং ভিন্ন গ্রামে যাইবার সময় রাহী-লোকেদের গমন-পথে না গিয়া সে যেখানে যত পুষ্করিণী আছে তার পাশ দিয়া যাইতে সুরু করিল। এমনি একদিন যাইতে-যাইতে একটি পানাপুকুরের শালগাছে-বাঁধানো ঘাটের কাছে খানিকটা স্বচ্ছ জলে একটি অপরূপ পদ্মমুখী ফুল ফুটিয়া আছে দেখিয়া অশ্বারোহী অশ্ব-বল্‌গা সংযত করিলেন।

পদ্মের কি অপরূপ রূপমাধুরী! কিন্তু পদ্ম কি অত বড় হয়? ঘোড়া হইতে নামিয়া পুকুরপাড়ে গিয়া একটি গাছের আড়াল হইতে গোপনে দেখিলেন, না, ও ফুল নয়—মানুষ।

স্নানরতা এক নিসর্গসুন্দরী তার মৃণাল-দেহ আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া যেন পদ্মরূপে ঐ জলে ভাসিতেছে!

বৈদ্যনাথ আর চোখ ফিরাইতে পারিলেন না। সহসা সুন্দরীর চোখও সেইদিকে পড়িতেই সে ত্রস্তে নিজেকে সামলাইয়া ভিজা-কাপড়ে জল হইতে উঠিয়া তার গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেল। বৈদ্যনাথ পিছু লইলেন।

সুন্দরী কিছুদূর যাইয়াই তেনা বাউরীর কুটীরের বেড়া ঠেলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

হতবাক্ বৈদ্যনাথ ভাবিয়া কূল পাইলেন না যে, এ-রত্ন এখানে কেন! এ যে 'গোবরে পদ্মফুল'!

তারপর একাগ্র মনে চিন্তা করিতে-করিতে যেন কূলে পৌঁছিলেন—ঠিক হইয়াছে। তাঁর কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে এই-ই ঠিক উপযুক্ত স্থান। ঠিক এইরকম রত্নই যেন তিনি এতদিন কামনা করিয়া আসিতেছেন। এবার অতনুদেবের পূজায় এই কুসুমপেলব পদ্মমুখীকে উৎসর্গ করিতে পারিলে তাঁর সাধনা সার্থক হইবে।

তখনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। তাঁর স্বগ্রামের লোকনাথ-হাড়ীর দ্বারস্থ হইয়া তার সঙ্গে মন্ত্রণা করিলেন....নানা উৎকোচে বশীভূত করিয়া লোকনাথকে যা-যা করিতে হইবে উপদেশ দিয়া, ভাগিনেয় নলিনচন্দ্রের ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া নিজে সাধু থাকিবার জন্য লোকনাথের গলায় পৈতা দিয়া তাকে বামুন সাজাইয়া নলিনের সঙ্গে বন্ধুতা করিবার জন্য

তাকে পরামর্শ দিলেন। লোকনাথ নলিনকে বলিবে, তার বউকে তেনা বাউরীর ছেলে ডাকাতি করিয়া হরণ করিয়া আনিয়াছে, আপনি রাজা—জমিদার—উহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া আমাকে ফিরাইয়া দিন।

লোকনাথ তাই বলিয়াছে....তরলমতি জমিদারপুত্রকে বুঝাইয়াছে—বাগ্দীর ঘরে কি প্রভু, অমন সুন্দরী জন্মায়, না লছিরামের মতন বাগ্দীর ও বৌ হইতে পারে ?

নলিনচন্দ্র বন্ধুর কথায় বিশ্বাস করিয়া সেদিন দুপুরে বাউরী-পল্লীতে গিয়া বন্ধুর বৌকে উদ্ধার করিতে না পারিয়া পালাইয়া আসিবার সময় শাসাইয়া আসিয়াছিল, রাত্রে আসিয়া তারা লছিরামের বৌকে লুট করিয়া লইয়া যাইবে, কেউ ঠেকাইতে পারিবে না।

সেইদিনই রাত্রে লোকনাথের দল নলিনকে সঙ্গে লইয়া লছিরামের বাড়ী আবার হানা দিবে কথা ছিল। কিন্তু গরীবের ভগবান আছেন। সেরাত্রে নলিন মায়ের আদেশে বাড়ীর বাহিরে যায় নাই, আর লোকনাথও রাত্রে নলিনকে ডাকিতে আসে নাই। তবে লোকনাথ সে-রাত্রে কোথায় ছিল ?

লোকনাথ ছিল ছাতার-কাপড় মুড়ি-দেওয়া শয়তান বৈদ্যনাথ সরকারের সঙ্গে। অমাবস্যার সেই তমিস্রা রাত্রে অসমঞ্জস ঝোপের পাশে দাঁড়াইয়া তারা যে বাষ্পীয়-আওয়াজে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, মহাকালের কৃপায় তা কারুর অজানা নাই।

তারপর ?

তারপর লোকনাথ ভিন্ গাঁয়ের লাঠিয়ালদের সঙ্গে লইয়া বাউরীপাড়ায় যখন লড়াই চালাইতেছিল, সেই অবসরে—শ্যামাসুন্দরীর আদেশে বাউরীগিন্নী তার বৌ ডালিমমণিকে যে ছিটেবেড়ার ঘরে শিকল বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই ঘরের পিছনদিকের বেড়া কাটিয়া সেই দলের জনকয়েক গুণ্ডা ডালিমমণির মুখে কাপড় চাপা দিয়া তাকে লইয়া পালাইয়া যায়। আর সখের টাট্টুর সওয়ার বৈদ্যনাথ সেই অন্ধকারে সাফল্যের অট্টহাসি হাসিতে-হাসিতে সোজা-পথে বাড়ী ফিরিয়া মনের আনন্দে খানিকটা সুধা পান করিয়া তাঁর বহু আয়াসলব্ধ রূপসী পরস্ত্রীকে আপন করিয়া লইবার কল্পনায় বিহ্বল হইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কিন্তু অনাথবন্ধু ভগবান আর সহ্য করিতে পারিলেন না। দুষ্কৃতকারী স্বৈরাচারীরা অন্ধকারে পথ ভুল করিয়া উল্টা-পথে একেবারে রহিমপুর থানার সামনে আসিয়া পড়িল।

তারপর সহসা হাতের নাগালে বামালসমেত লুটেলদের পাইয়া পুলিসের কর্ত্তব্য পুলিস করিয়াছে।

*

* *

সেদিন অপরাহ্নে পুলিস আসিয়া, তেনা বাউরীর পুত্রবধূ-হরণ অপরাধে যখন বৈদ্যনাথকে গ্রেপ্তার করিল তখন গ্রামের লোকের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। বৈদ্যনাথবাবু প্রথমে দরোয়ান দিয়া পুলিসকে অর্দ্ধচন্দ্র দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হইবার আগেই তাঁর হাতে হাতকড়ি পড়িয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে প্রকাশ পাইল যে, তেনা বাউরীর পুত্রবধূহরণ অপরাধে নলিন মোটেই অপরাধী নয়, বৈদ্যনাথের চক্রান্তেই তার বাড়ী লুট এবং তার পুত্রবধূ ডালিমমণি অপহৃত হইয়াছিল; বৈদ্যনাথ নলিনকে দোষী খাড়া করিয়া তার ঘাড়েই অপরাধটা চাপাইয়া দিয়া আপনার পথটাকে নিষ্কণ্টক করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন।

শত্রুপক্ষ বৈদ্যনাথের মুখের সামনেই তাঁকে ধিক্কার দিতে লাগিল। মিত্রপক্ষ এসব ছোটবাবুর চক্রান্ত বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল।

লুটের লাঠিয়ালরা কিন্তু গ্রেপ্তার হইবার পর যখন বৈদ্যনাথবাবুকেই আপনাদের নিয়োজক বলিয়া সাক্ষী দিল তখন মিত্রপক্ষকে অগত্যা নিরস্ত এবং বৈদ্যনাথকে নৈরাশ্যের দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিতে হইল।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে আর-একটা সংবাদ আসিল, লুণ্ঠিত চালানের সাক্ষী গোমস্তা গোকুল তার নিজের বাড়ীতে গ্রেপ্তার হইয়াছে এবং তার বাড়ীতে জোর খানাতল্লাসীর ফলে লুণ্ঠিত টাকা প্রায় সমস্তই পাওয়া গিয়াছে। বন্দী গোমস্তার মুখে প্রকাশ, যে, এই লুটের সঙ্গে বৈদ্যনাথবাবুর সম্পূর্ণ সংস্রব রহিয়াছে এবং তাঁর আদেশেই গুণ্ডারা লুট করিতে গিয়াছিল। লুট সম্পর্কে নলিনের নাম কেউ মুখেও আনিল না। লুট, ডাকাতি ও নারীহরণ এই তিন অপরাধে পুলিস বৈদ্যনাথকে সদরে চালান দিল।

জমিদারীর সঙ্গে জমিদারপুত্রকে রক্ষা পাইতে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইল এবং যেন মন্ত্রশক্তির সাহায্যে এই রহস্যভেদ করিতে দেখিয়া ছোটবাবুকে ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল। অনেকেই অনুমান করিল, এবার খুড়ো-ভাইপোর মধ্যে আবার মিল হইবে।

প্রিয়নাথ কিন্তু এই মিলনের জন্য অপেক্ষা করিলেন না; যথাসময়ে লাটের খাজনা দাখিল করিয়া আর উপযুক্ত ম্যানেজার রাখিবার জন্য শ্যামাসুন্দরীকে পরামর্শ দিয়া সরিয়া গেলেন।

রমেশ চৌধুরী প্রিয়নাথকে ম্যানেজারপদে নিযুক্ত করিবার জন্য নলিনকে পরামর্শ দিলেন…শ্যামাসুন্দরী কিন্তু তাতে সম্মতি দিলেন না। অগত্যা নূতন ম্যানেজার নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত রমেশবাবুই ম্যানেজারের কাজ পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

জমিদারীর গোলযোগে নলিনের বিবাহের কথাটা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, এখন সে-কথাটা আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিতেই বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল এবং উভয় পক্ষেই বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতে লাগিল।

*

* *

—"মা ?"

—"কেন রে নলিন ?"

—"বিয়ের কি সব ঠিক হয়ে গেছে মা ?"

আশ্চর্য্য হইয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "ছেলের কথা শোনো একবার ! পরশু বিয়ে, আর আজ বল্‌ছিস্, বিয়ে ঠিক হয়েছে কিনা ?"

নলিন নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া দেয়ালের গায়ে আঙুলের টোকা দিতে লাগিল।

শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বল্ তো ?"

নলিন বলিল, "না, তাই জিগেস্ কচ্ছি।"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "কেন, তুই কি এতদিন শুনিস্ নি ?"

নলিন বলিল, "শুনেছি····তবে···আচ্ছা মা ?"

—"কি, বল্ না !"

—"আচ্ছা, ঠিক ক'রে বলো তো, এ বিয়েতে কি তোমার মত আছে ?"

—"মত না থাকলে আর বিয়ে দিচ্ছি ?"

—"সেরকম মত নয়। তোমার মনের কি ইচ্ছে আমি সেইটে জানতে চাই।"

পুত্রের আনতমুখের দিকে চাহিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "কেন রে নলিন, এ-কথা জিগেস্ করছিস্ কেন—কি হয়েছে ?"

একটু ইতস্তত করিয়া নলিন উত্তর দিল ; "হয় নি কিছু, তবে—মানে, আমি ওখানে বিয়ে করবো না।"

দারুণ বিস্ময়ে শ্যামাসুন্দরীর দৃষ্টি বিস্ফারিত হইয়া আসিল। তিনি খানিক অবাকবিস্ময়ে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুই বলিস্ কি রে—য়ঁ্যা ? বিয়ের সব ঠিক, আর তুই বিয়ে করবি নি ?"

দৃঢ়স্বরে নলিন বলিল, "না।"

শ্যামাসুন্দরী যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন....কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে থাকিয়া তিনি ধীরে-ধীরে বলিলেন, 'কেন রে। বিয়ে করবি নি কেন ?"

—"এ-বিয়েতে তুমি সুখী নও ব'লে।"

শ্যামাসুন্দরী চমকিয়া উঠিলেন...ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বললে আমি সুখী নই ?"

—"আমি বলছি।"

—"তুই ভুল বলছিস্ !"

—"না. ভুল নয়। আমি ঠিক জানি যে, রাধুর সঙ্গে সতীর বিয়ে হলেই তুমি সুখী হও।"

পুত্রের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া মা বলিলেন, "আমি কি মনে করেছি তা তুই কি ক'রে জানলি ?"

—"আমি যে তোমার ছেলে। তুমি শুধু আমার জিদ দেখেই এ-বিয়েতে মত দিয়েছিলে। কেমন, ঠিক কি না বলো ?"

ছেলের কাছে ধরা পড়িয়া শ্যামাসুন্দরী মাথা নীচু করিলেন।

নলিন হাসিতে-হাসিতে বলিল, "ঠিক ধরেছি তো ?"

শ্যামাসুন্দরীও এবার না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

নলিন বলিল, "শুধু তুমি নও মা, এ-বিয়েতে কেউ সুখী নয়।"

—"অসুখী আবার তুই কাকে দেখলি ?"

—"সুখীও তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না !"

একটু ভাবিয়া শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সতী কি তোকে কিছু বলেছে ?"

নতমুখে নলিন বলিল, "না....মুখে কিছু বলে নি....কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি যে, সবচেয়ে অসুখী ঐ মেয়েটা।"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তাই বুঝি তুই বিয়ে করতে নারাজ ?"

ম্লানমুখে নলিন বলিল, "সেটাও একটা কারণ বটে ;

কিন্তু মা, সকলের যখন অমত তখন আমিই-বা জিদ ক'রে এ-বিয়েতে রাজী হই কেন ?"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তা নয় বুঝলাম, কিন্তু এতদূর এগিয়ে এখন কি ক'রে বন্ধ করা যায় বল্ ?"

—"সোজা কথায়....ছেলে রাজী নয় ব'লে।"

—তোর পক্ষে যেটা সোজা, রমেশবাবুর পক্ষে সেইটে তার ফাঁসির কারণ হবে যে রে ! সে গরীবের উদ্যোগ-আয়োজন সব পণ্ড হবে যে।"

—"পণ্ড হবে কেন ?"

—"পরশু বিয়ে, সে পাত্র পাবে কোথায় ?"

—"কেন, পাত্র তো অনেক আগেই ঠিক হয়ে আছে মা !"

—"কে পাত্র ? ....রাধু ?"

—"হ্যাঁ। রেধোর সঙ্গেই তো কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল।"

—"যখন ঠিক হয়েছিল তখন রাধুর বাপ তার ছেলের সাত টাকার মাইনের উপর নির্ভর ক'রে ছিল না, আর রাধুও যে কোনদিন মুদীর দোকানে চাকরি করবে এ-কথাও কেউ ভাবে নি।"

নলিন বলিল, "করলেই-বা চাকরি, তাতে আর কি হয়েছে ?"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "আর-কিছু হোক্ না হোক্, তেমন 'অষ্ঠ ভক্ষ্য ধনুর্গুণ' লোকের ঘরে কেউ মেয়ে দিতে যায় না।"

ভ্রূকুটী করিয়া নলিন বলিল, "রমেশবাবুই কোন্ লক্ষপতি ? তিনিও তো কুড়ি টাকা মাইনের চাকরি করেন !"

—"করলেও তার ঠাকুরপোর মতন অবস্থা নয়।"

ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া নলিন বলিল, "তাহ'লে এখন উপায় ?"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন,"উপায় তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না বাবা, তোকেই বিয়ে করতে হবে।"

—"কক্‌খনো না" বলিয়া নলিন জোরে ঘাড় নাড়িয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

শ্যামাসুন্দরী ছেলেকে জানেন। একবার যখন ও 'না' বলিয়াছে তখন ওকে 'হাঁ' বলানো খুবই কঠিন। উনি মনে-মনে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন, এমন সময় নলিন বলিল, "শোনো, দুটি কাজ তোমাকে করতে হবে মা। না করলে তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "কি কাজ তাই বল্ আগে ?"

নলিন বলিল,"প্রথম কাজ হচ্ছে, যেমন ক'রে হোক্, রাধুর সঙ্গে সতীর বিয়ে দিতে হবে, আর দ্বিতীয়টা এই যে, মামার যাতে জেল না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে তাতে যত টাকাই লাগুক্। চুরী-ডাকাতি যাই করুন, তিনি আমার মামা।"

একটু চিন্তা করিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "তোর প্রথম কথাটা রাখার পাকা-কথা এখন আমি দিতে পারছি না, তবে চেষ্টা করবো। আর দ্বিতীয় কথার জবাব আমি কি দেবো বাবা! দোষ যদি তিনি ক'রে থাকেন তার শাস্তি তাঁকে নিতেই হবে। তবে তিনি তোর যেমন মামা, আমারও তেমনি বড়

ভাই। কিন্তু তোকেও আমার একটা কথা রাখতে হবে নলিন।"

নলিন হাসিল; বলিল, "কথা নয় মা, হুকুম বলো। বলো তোমার কি হুকুম!"

—"আমি যে কাজ করবো, তার ওপর একটি কথাও তুমি কইবে না। এমনকি, আমি যদি এই জমিদারীটা কাউকে বিলিয়ে দিই—"

—"না মা, তাহ'লেও আমি একটি 'টু' শব্দ করবো না। আমি রমানাথ মল্লিকের ছেলে···আমার কথার দাম আছে।"

বলিয়া নলিন দ্রুতপদে বাহিরের দিকে চলিয়া গেল।

শ্যামাসুন্দরী প্রশংসমান দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পথ চলিতে সহসা পিছন হইতে আহ্বান আসিল, "সতী!"

চমকাইয়া সতী ঘাড় ফিরাইল—"কে গা?"

—"আমি রাধু।"

—"তবে তো একেবারে স্বর্গে পৌঁছে গেলাম।" বলিয়া সতি একগাল হাসিয়া ফেলিল।

পিছন দিক হইতে ঘুরিয়া সামনে আসিয়া পরিহাসতরল-কণ্ঠে রাধু বলিল, "যদি বলতাম, আমি—নলিন?"

সেই হাসির জের টানিয়া সতী বলিল, "তাহ'লে টুপ্ ক'রে নরকে ডুবে যেতাম! কেমন, হয়েছে তো? ····আচ্ছা, ঝগড়া না ক'রে তুমি কি একদণ্ড থাকতে পারো না! যখন-তখন

এসে এমন ক'রে আমার পথ আগলাবে কেন বলো তো! কি করেছি তোমার আমি?"

—"আমার আবার তুই করবি কি! বড়লোকের বউ হবি ব'লে ভয়ে তোকে পথ ছেড়ে দিতে হবে নাকি? যতই কেন আহ্লাদ করো না, সে-গুড়ে বালি!" বলিয়া অর্দ্ধমুষ্টিবদ্ধ হাত দু'খানা নাড়িয়া সতীর মুখের কাছে রাধু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইল।

রাগাইয়া মজা দেখিবার লোভে সতী বলিল, "নলিনগুড়ে কি আর বালি থাকে গা রাধুবাবু! তুমি কেমনধারা মুদি?"

প্রেম-অভিনয়পক্ক দক্ষ অভিনেতার মুখের ভাব আনিয়া আবেগের সুরে রাধু ডাকিল, "সতী!"

মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া সতী বলিল, "মুদীকে মুদী বলবো তার আবার সতী-অসতী কি আছে!"

—"রাধানাথ যার বর হবে সে কি কখনো অসতী হতে পারে সতি?" বলিয়াই রাধু একেবারে সতীর হাত দু'খানা চাপিয়া ধরিল।

পল্লী বালক-বালিকার সরলতা-মাখা নিষ্কলুষ বাল্যপ্রেম।

আরও বালিকা বয়সে আরও কত-শতবার রাধু সতীর হাত এমনি করিয়াই ধরিয়াছে....ধরিয়া গাছতলায় সতীকে দাঁড় করাইয়া গাছে উঠিয়া কত সময়ের ফল আহরণ করিয়া নীচে ফেলিয়াছে...সতী আঁচল ভরিয়া সে-সব আহরিত ফল লইয়া হাসিতে-হাসিতে ঘরের দিকে ফিরিয়াছে। কিন্তু বয়সের একটা ধর্ম্ম আছে তো! আজ রাধু সতীর হাত চাপিয়া ধরিতেই

বালিকার সারা দেহে যেন চিকুর চমকিয়া গেল। কি এক অজানা আবেশে অবশ হইয়া সেই বন্য-পথের পাশে ছায়ানিবিড় একটা ঝোপের তলায় বসিয়া পড়িয়া সতী বলিল, "হাত ছাড়ো গো রাধানাথ! লোকে দেখলে বলবে কি?"

রাধু বলিল, "লোকে বলবে, রাধানাথ আজ 'বনমালি' হয়েছে। চলো গো সতীরাণি, ঝোপ ছেড়ে এখন ঐ পুকুর-ঘাটে ব'সে একটু গল্প করিগে চলো!"

গোধূলির ধূলা-খেলা তখনও শেষ হয় নাই, সন্ধ্যাদেবী তখনও ত্রিভুবন অন্ধকার দেখে নাই, বেলা অপরাহ্ণ। কুমারী নাম ঘুচাইয়া সিঁদুর মাথায় দিবার আগে হিঁদুর ঘরের গৌরীমেয়ে—আগামীকাল যাদের বিবাহ হইবে এমন মেয়েরা বাল্যসঙ্গিনীদের কাছ হইতে বাল্যসখীত্বের শেষ বিদায়-পর্ব্ব শেষ করিয়া মাঠের উপর দিয়া ঘরে ফিরিতেছিল, ওদেরই মধ্যে এক চঞ্চলা বালিকা নির্জ্জন দেখিয়া অপর সঙ্গিনীদের আনন্দ বিলাইবার জন্য বে-সুরে বে-লয়ে গান ধরিয়াছিল :

ঘটার বিয়ে, ঘটার বর ;
চল্ লো ক'নে শ্বশুরঘর !

অদূরে তালপুকুরের কাঁকরের রাণায় বসিয়া সতীর হাত হাতে লইয়া রাধু বলিয়া উঠিল, "শুন্‌লি সতী, বিয়ের গান? জ্যাঠাইমা বলেছে, তোর সঙ্গেই এবার আমার বিয়ে হবে, নলিনদাও তাতে রাজী হয়েছে, এখন তোর কি মত?"

পাতলা রাঙা ঠোঁটে অল্প হাসির রেখা টানিয়া সতী

বলিল,"ভ্যেৎ! বিয়েতে বুঝি আবার কখনো ক'নেরা মত দেয়? বাপ-মা যেদিন দেবে মত, আমি পরবো মল-নথ, সেদিন বুঝবে আমার মত। এখন আমার অমত।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিতেই, সতীর মাথাটা নিজের কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া রাধু বলিল, "যখন মিষ্টি-কথায় মত পাওয়া যায় না তখন দুষ্টুমি করেই মত করিয়ে নিতে হয়। যাক্, শোন্! এখন আমি তোকে একটু ঘুম পাড়াই, তুই ঘুমো। মানে, আমি জানি, ঘুম থেকে জাগলে আর আগের কথা হঠাৎ মনে পড়ে না; তাহ'লেই এই 'অমত' কথাটা ভুলে যাবি, আর চট্ ক'রে 'মত' দিয়ে ফেলবি—বুঝলি?"

চিরদিনের সত্য-আশ্রয়ের মধ্যে নিরাপদ হইলাম ভাবিয়া কি এক অজানা আনন্দে সতীর দেহে শিহরণ আসিতেছিল; শত চেষ্টাতেও কথা কহিবার শক্তি আনিতে না পারিয়া, রাধুর কোলে মাথা রাখিয়া নির্জ্জীবের মতই পড়িয়া থাকিবার মুহূর্ত্তে সহসা পিছন দিক হইতে ক্রোধপরুষ-রুক্ষকণ্ঠে যে বরাবর ডাকে সে হাঁকিল, "রেধো!"

স্বরে পরিচিতকণ্ঠের আভাস পাইয়া রাজ্যির লজ্জায় এতক্ষণে সতী দুই হাতে মুখ ঢাকিল···তাড়াতাড়ি সামলাইতে না পারিয়া, সতীর মাথা কোলে লইয়াই রাধু উত্তর করিল,"কেন, কি হয়েছে?"

—"এর চেয়ে আর কি বেশী হবে রে পাজী! ভর্‌সন্ধ্যে-বেলায় ঘর ছেড়ে এই মাঠের ধারে, পুকুরপাড়ে ব'সে চুপিসারে পালাবার মতলব হচ্ছে; আর হবার বাকি কি?"

বিস্ময়রুদ্ধকণ্ঠে রাধু বলিল, "এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি দাদাবাবু, আমরা কোন মতলব আঁটবার জন্যে এখানে—"

—"চুপ কর্ বোকারাম, আর ন্যাকামী করতে হবে না। যেজন্যে তোমরা এসেছো তা আমি—শুধু আমি কেন, বাড়ী-সুদ্ধু সবাই জানতে পেরেছে। আর-একটু পরে এলেই তোমরা গাঁছাড়া হয়েছিলে আর কি! ভাগ্যে কাল একটা বিয়ের দিন আছে, নইলে তোমার হাত থেকে ছিনিয়ে বিয়ে করা,—উঃ, কি হিংসুক রে তুই!" বলিয়াই নলিন চুপ করিল।

সন্ধ্যার বাতাস আকাশে ভাসিয়া নীচে নামিতেছিল—ফুর্ ফুর্ ফুর্! মন্দিরের পুরোহিত দেবীর পদে ফুল ঢালিতেছিলেন—ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্! সন্ধ্যারতির ঘণ্টা-শঙ্খধ্বনি দিক্ প্রকম্পিত করিয়া মহাপাপীর বুক কাঁপাইতেছিল—গুর্ গুর্ গুর্!

দূরে জমিদারবাড়ীর নহবতখানা হইতে সানাইএর রাগিণী পূরবীর তানে সন্ধ্যাদেবীর বন্দনায় আবাহন-গীতি গাহিতেছিল, দেবী আসিলেন। আগামী-সন্ধ্যায় প্রজাপতির আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিতে করিতে সন্ধ্যাদেবী মূর্ত্ত হইয়া আশীষ-কর প্রসারণ করিলেন। গৃহস্থের বধূরা দীপ জ্বালিয়া সন্ধ্যাদেবীর মনের অন্ধকার দূর করিল, বাহিরে কিন্তু সেই অন্ধকার! আর-একটু পরে বুঝি-বা কোলের মানুষকেও আর দেখা যাইবে না!···· 'ওঠ্ সতী, উঠে বোস্।'····রাধুর অঙ্গের এইরকম ইঙ্গিত পাইয়া প্রত্যক্ষ আলোর কোল হইতে সতী অন্ধকারের আশ্রয় লইল।

রাধু নলিনের কাছে সরিয়া বসিল।

বহুক্ষণ পরে বিশ্বগ্রাসী নিকষ-কালো অন্ধকারের গুরুগম্ভীর নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া রাধু প্রথম কথা কহিল, "দাদাবাবু?"

—"কি?"

—"তোমার চোখে আমি আর সব হতে পারি, তাই ব'লে হিংসুক নই। কিন্তু যাক্, অনেকক্ষণ সন্ধ্যে উৎরে গেছে....সতীকে এবার ওদের বাড়ীতে রেখে আসতে হবে, এখন আমি যাই।"

—"যেতে হয় তুমি একলা যাও; সতীকে কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে হবে। কাল যে ওর সঙ্গে আমার বিয়ে।"

সতী হঠাৎ সরিয়া আসিয়া রাধুর হাত ধরিয়া ভীতিবিহ্বল-কণ্ঠে বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাবো। কখন সন্ধ্যে হয়েছে, মা কত ভাবছে, বাবা হয়তো এতক্ষণ খুঁজতে বেরিয়েছেন। উঃ, কি অন্ধকার। ভয় করছে আমার।"

—"ভয় কি সতী. আমি তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো, রেখো তোমার কে? কাল যখন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে—আমার সঙ্গে গেলে তোমায় কেউ কিছু বলবে না। রেখো বেটাছেলে, ও একা যেতে পারবে। এই অন্ধকারে... ছেলেমানুষ তুমি...এসো এসো....আমার সঙ্গে এসো!" বলিয়া রাধুর পাশ দিয়া নলিন সতীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতন রাধু নিরুত্তরে নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল।

—"নলিনবাবু ?" সামর্থ্যের অতিরিক্ত জোরগলায় সতী ডাকিল, "নলিনবাবু ?"

মুচকি হাসিয়া নলিন বলিল, "কি ?"

সতী বলিল, "তোমার সঙ্গে আমি যাবো না, আমার আশা এবার ছেড়ে দাও। তুমি জমিদার—আমরা গরীব লোক। তুমি ইচ্ছে করলে কত পরীর মতন মেয়ে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। তা পড়ুকগে। তাই ব'লে তুমি একজনের বিয়ের ক'নেকে কেড়ে নেবে নাকি ? হিঁদুর ঘরের মেয়ের কখনো দু'বার বিয়ে হতে দেখেছো, নলিনবাবু ?"

নলিন বলিল, "তা যেন দেখি নি, কিন্তু তোমার আবার বিয়ে হলো কবে ? আমার সঙ্গেই তো তোমার বিয়ে হবে—আমিই তো তোমার বর !"

—"না। তুমি আমার বর নও, আমার বর এই তোমার ছোট ভাই, তুমি আমার ভাশুর।" বলিয়া সতী সরিয়া দাঁড়াইল।

এতক্ষণের পর বহুরূপী পরীক্ষকের খোলসটা খুলিয়া ফেলিয়া নলিন দারুণ উল্লসিত হইয়া বলিল, "যদি তাই হয়, তবে সে তোমাদের বিয়ের পর। এখন এসো বোন্ ! তোমাকে আজ রাজার রাণী সাজিয়ে দিয়ে, আমাদের অন্ধকারে-পাতানো 'ভাই-বোন'এর সম্পর্কটা এই আলো-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে আজ এজন্মের মতন এখুনি শেষ ক'রে ফেলি।"

একপাশে দাঁড়াইয়া রাধু এতক্ষণ শুধু মোহাবিষ্টের মতন শুনিতেছিল, এবার আর থাকিতে না পারিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উ ল, "দাদা ?"

—"ভাই।" বলিয়াই নলিন, রাধুর বাহু-বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হইল।

সতীর বুকের ভিতর এতক্ষণ অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর আনন্দাশ্রু-স্রোত বহিতেছিল, বাহিরে চিরদিনের শত্রুতার বাঁধ আলিঙ্গনাশ্রু-বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছিল। এই আলোকোজ্জ্বল দৃশ্য দেখিবার লোভে অনুচ্চস্বরে সতী বলিয়া উঠিল, "উঃ, কি অন্ধকার!"

—"হ্যাঁ, খুব অন্ধকার। এখন একটু আলো চাই—না?" বলিয়া নলিন সঙ্কেতধ্বনি করিতেই লণ্ঠনধারী দুইজন ভৃত্য আসিয়া আলো রাখিয়া চলিয়া গেল।

পৃথিবীর লজ্জা আসিয়া যখন সতীর মুখে বাসা পাতিবার উপক্রম করিতেছিল সেইসময় সতীর হাতটা ধরিয়া রাধু বলিয়া উঠিল, "এত লজ্জা কিসের সতী! দাদাবাবু যে আজ তোর বড় ভাই। এমন দিন কি আর পাবি রে! আয় আমরা নমস্কার করি।"

"ভাবি বর-বধূর চারিটি যুক্ত কর যেন মন্ত্রশক্তির বলে ঊর্দ্ধে উঠিয়াই দুইটি শিরসহ শ্রদ্ধায় আনত হইল।

রমেশ চৌধুরী যখন প্রিয়নাথের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া অনুতপ্তকণ্ঠে বলিলেন,"আমি অনেক অপরাধ করেছি ছোটবাবু, এবার আমাকে মাপ করতেই হবে" তখন প্রিয়নাথ প্রথমটা বিস্ময়ে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন; তারপর রমেশবাবুর হাত ধরিয়া তুলিয়া ধীরে-ধীরে বলিলেন,"কি হয়েছে রমেশবাবু? আবার কি আপনি আমায় পরিহাস করতে এসেছেন?"

দারুণ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া রমেশবাবু বলিলেন, "পরিহাস নয় ছোটবাবু, সত্যই আজ আমি আপনার দয়া ভিক্ষে করতে এসেছি। এখন আপনি না দয়া করলে আমার আর উপায় নেই।"

ওঁর কথায় আর ভাবভঙ্গিতে পরিহাসের লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত প্রিয়নাথ ব্যাপার কি জানিতে চাহিলেন।

রমেশবাবু তখন বিবাহে নলিনের অসম্মতির কথা জানাইয়া প্রিয়নাথকে বলিলেন যে, তিনি না বুঝিয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এখন তাঁর সব অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া প্রিয়নাথ যদি তাঁকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার না করেন তা হইলে সত্যই তাঁর আর অন্য উপায় নাই।

প্রিয়নাথ নিজের দৈন্য স্মরণ করাইয়া দিয়া রমেশবাবুকে নিবৃত্ত হইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিলেন। রমেশবাবু কিন্তু কোন অনুরোধ না শুনিয়া হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "আমি কোন ওজর শুনবো না ছোটবাবু। আপনি মত না করেন তো সতীকে এনে আপনার পায়ের উপর ফেলে দেবো।"

ইহার উপর প্রিয়নাথ আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না।—"ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন" বলিয়াই রমেশবাবু আর অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদক্ষেপে বাহির হইয়া গেলেন।

দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আন্নাকালী এতক্ষণ সব শুনিতেছিল। রমেশবাবু চলিয়া যাইবার পর স্বামীকে একলা

পাইয়া সুধাইল, "হ্যাঁ গা, নিজেদেরই দিন চলে না, আবার বৌ ঘরে এনে খাওয়াবে কি ?"

সাফল্যের হাসি হাসিয়া প্রিয়নাথ বলিলেন, "বৌকে আর আমাদের খাওয়াতে হবে না ছোটবৌ, এরপর থেকে—বৌমাই আমাদের খাওয়াবে।"

আন্নাকালী হাসিয়া উঠিল ; বলিল, "মন্দ কথা নয়। বৌমাকেও একটা দোকানে চাকরি দেখে দেবে নাকি ?"

গম্ভীর ভাবে প্রিয়নাথ বলিলেন, "তামাসা নয় ছোটবৌ, দেখে নিও তুমি, বৌমা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আমার স্বপ্ন যখন সব সত্যি হয়েছে তখন এটাও মিথ্যে হবে না। বিয়ের ক'নে সতীরাণী কুবেরের ঐশ্বর্য্য কাঁখে নিয়ে ঠিক লক্ষ্মীঠাকরুণের মতনই আমার ঘর উথলে দিতে আসছে এ যেন আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।"

বর-বধূ আসিয়া যখন প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল তখন শ্যামাসুন্দরী সতীর হাতে লক্ষ্মীর কৌটা দিয়া প্রিয়নাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যে লক্ষ্মীর কৌটার তরে এত ঝগড়া-বিবাদ ঠাকুরপো, সেই লক্ষ্মীর কৌটাটি তোমাকেও দেবো না, আমিও নেবো না ; বৌমাকে দিয়ে আজ সব বিবাদের শেষ ক'রে দিলাম। আজ থেকে ওতে আমাদের কোন অধিকার নেই, আমার ঘরের লক্ষ্মীর হাতেই মা-লক্ষ্মীকে সঁপে দিলাম।"

হর্ষপ্রফুল্লকণ্ঠে প্রিয়নাথ বলিলেন, "সেই ভালো বৌঠান,

এখন ওদের হাতে সব সঁপে দিয়ে আমরা এই বিবাদের রঙ্গক্ষেত্র হতে সরে দাঁড়াই চলো।"

নলিন সামনে আসিয়া গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "সেটি হচ্ছে না কাকাবাবু। নলিনচন্দ্র এত বোকা নয় যে— মামাবাবুর হাত থেকে জমিদারীটা কেড়ে নিয়ে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তুমি সরে দাঁড়াবে আর সে সেই বোঝা ঘাড় পেতে নেবে। লক্ষ্মীর বোঝা রেধোর ঘাড়ে চাপিয়েছি, এখন জমিদারীর বোঝা তোমার ঘাড়ে তুলে দিয়ে আমি যে আত্নুরে নলিনচন্দ্র সেই আত্নুরে নলিনচন্দ্রই থাকবো তা ব'লে দিচ্ছি।"

প্রিয়নাথ ভাইপোর মাথায় হাত রাখিয়া বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "তাই হবে নলিন, প্রিয়নাথ বেঁচে থাকতে আমোদ-আহ্লাদ ছেড়ে তোকে কোনদিন জমিদারীর বোঝা ঘাড়ে নিতে হবে না। তবে তোর ব্যবস্থাও আমি অনেক আগে থেকেই ক'রে রেখেছি···আমার প্রিয়বন্ধু রাজহাটির জমিদার মনোহরের মেয়ে গৌরীর সঙ্গে তোর বিয়ের ব্যবস্থা হয়েই আছে।··· চলো বৌঠান্, সে-সব কথা তোমায় ঘরে গিয়ে বলিগে।"

নলিন মাথা নত করিয়া প্রিয়নাথের পদধূলি গ্রহণ করিল আন্নাকালী শঙ্খধ্বনি করিল। মঙ্গল শঙ্খধ্বনিতে পাঁচ বছরের বিবাদের কোলাহল এক মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া গেল।

ইতি